পড়াশোনার ক্রোড়পত্র

যুগশঙ্খ SUPPLI
মঙ্গলবার, ২৯ আগস্ট ২০১৭

উত্তরণ

যুগশঙ্খ-র সঙ্গে ৮ পাতার রঙিন ক্রোড়পত্র

শিক্ষাগুরুর পরামর্শ

নন্দকুমার কুণ্ডু সহকারী প্রধান শিক্ষক
ইছাপুর এন সি উচ্চ বিদ্যালয়

রুটিন করে সব বিষয়ে সমান নজর দিতে হবে

পাঠ্যবইগুলি খুব ভালো করে পড়া উচিত। মানে শুধু সাজেশন অনুযায়ী পড়ব, সেটি না করে প্রতিটি লাইন খুঁটিয়ে পড়তে হবে। ভালো রেজাল্ট করতে হলে সিলেবাস ভালো করে অনুসরণ করা উচিত। অঙ্ক-র বিষয়ে বলব বারবার অভ্যাস করতে হবে। মানে অনেক সময় ছাত্রছাত্রীদের মনে হয়, আমি এই অঙ্কটি পারব, তাই আমার আর এত অভ্যাস না করলেও চলবে। কিন্তু সেটি ঠিক নয়।

অভ্যাস বিষয়টি খুব জরুরি। সিলেবাস শেষ করার পর প্রশ্ন-উত্তর সমাধানের দিকে মন দিতে হবে। ছাত্রছাত্রীরা যদি টেস্ট পেপার সমাধান করে তাহলে পরীক্ষার খাতায় অনেক কিছু তারা কমন পেয়ে যাবে। অভ্যাসের সঙ্গে সময়ের বিষয়টিকেও বুঝতে হবে। তাই ঘড়ি ধরে অভ্যাস করাটা খুব জরুরি। এর ফলে নিজের মধ্যে আত্মবিশ্বাস গড়ে উঠবে। প্রশ্ন ভীতিটাও কেটে যাবে।

প্রতিদিন পড়াশোনা অভ্যাসের ক্ষেত্রে বলব, স্কুলে যেগুলি শেখানো হয়, তা বাড়িতে গিয়ে নিয়মিত অভ্যাস করা। এছাড়া বাড়িতে নিজে একটি নির্দিষ্ট রুটিন অনুসরণ করে পড়াশোনা করা উচিত। আসলে রুটিন করে অভ্যাস করলে সব বিষয়গুলির ওপর সমানভাবে নজর দেওয়া যায়। না হলে একটি বিষয়ের ওপর বেশি মনোযোগী হতে গিয়ে অন্য বিষয়গুলি সেইভাবে পড়া হয়ে ওঠে না। সব বিষয়গুলিকেই সমান নজরে রাখতে হবে। তাহলেই ভালো রেজাল্ট করা সম্ভব হবে।

ছোট থেকেই সন্তানকে ‘প্রকৃতিকে ভালোবাসা’র শিক্ষা দিন

অভ্যাস খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। একটি শিশুকে ছোট বয়স থেকেই এই শিক্ষার পাঠ শেখানো উচিত। অভ্যাসের মাধ্যমে তাকে পরিবেশ সম্পর্কেও সচেতন করে তুলতে হবে। তাহলে তার মধ্যে সচেতনতা গড়ে উঠবে। প্রত্যেক অভিভাবকদের উচিত জন্মের পর শিশু যখন আস্তে আস্তে কিছু বুঝতে শিখবে তখন তাকে সেই পরিবেশ সম্বন্ধীয় পাঠ দেওয়া। অনেক সময় আমরা ভাবি, শিশুরা পরিবেশ বা গাছপালার ক্ষতির বিষয়টা বুঝতে পারে না। এটা ঠিক, হয়তো তিন বছরের একটা শিশু এসব উপলব্ধি করতে পারছে না। কিন্তু সে যখন আস্তে আস্তে বড় হবে পরিবেশ বা প্রকৃতি সম্পর্কেও তার কৌতূহল বাড়বে। সে তখন নিজে থেকেই পরিচিত হতে চাইবে।

পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলার নিজস্ব কিছু মাধ্যম আছে। দৈনন্দিন জীবনের মাধ্যমে আপনি শেখাতে পারেন। যেমন দিনেরবেলা প্রয়োজন ছাড়া আলো জ্বালিয়ে রাখার অভ্যাস থাকে অনেকের। অভিভাবকের উচিত সন্তানকে বলা বিদ্যুৎ সাশ্রয় কেন জরুরি পরিবেশের জন্য। তাহলে সে ছোট থেকেই সেই অভ্যাস গড়ে তুলবে। তবে একজন সন্তানের মধ্যে এই ধরনের অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য অভিভাবকদেরও সচেতন হতে হবে। তবে ছোট থেকেই সে বুঝতে শিখবে, তার এই কাজগুলো করা উচিত। প্রত্যেক অভিভাবকের জানা উচিত, শিশুরা সবসময় বড়দের অনুকরণ করে। তাই সমস্ত নির্দেশগুলি দেওয়ার আগে সেগুলি অভিভাবকদেরও পালন করা উচিত নিজেদের জীবনে।

আলোর মতোই আমাদের জীবনে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল জল। যা অপচয় করা একেবারেই ঠিক নয়। আর প্রয়োজনের অতিরিক্ত জল খরচ করাটাও ঠিক নয়। তাই শিশুকে ছোট থেকেই শেখাতে হবে অযথা জল নিয়ে না খেলতে। দেখা গেল, জলের ট্যাপ খুলে রেখে দাঁত মাজছে। মায়েরাও অনেক সময় এই ধরনের কাজ করেন, যা ঠিক নয়।

এছাড়া আমাদের সকলের উচিত প্রকৃতিকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা। শুধু মুখে বললেই হয় না, *এরপর পরের পাতায়*

জেনারেল নলেজ: দুই, ছয় ও আটের পাতায় || স্পেশাল টিউশন: তিনের পাতায়
ক্লাস (সেভেন-নাইন) টিউশন: চার ও পাঁচের পাতায় || ক্যুইজ: সাতের পাতায়

উত্তরণ-এর মুখোমুখি: রোল নং ওয়ান

অলঙ্কার রায় দশম শ্রেণি
বাতিকরা হাই স্কুল (উ.মা.), পুরুলিয়া

পড়াশোনায় মনোযোগ বাড়াতে নিয়মিত ধ্যান করি

অলঙ্কার রায়। ক্লাস ওয়ান থেকেই প্রথম স্থান অধিকার করছে পুরুলিয়ার বাতিকরা হাইস্কুলের দশম শ্রেণির এই ছাত্র। মাধ্যমিক পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করে অভিভাবক ও শিক্ষকদের মুখ উজ্জ্বল করতে চায় সে। অ্যাডভেঞ্চার প্রিয় অলঙ্কার নিজের পড়াশোনার প্রতি আরও মনোযোগ ও একাগ্রতা বাড়াতে নিয়মিত ধ্যান করতে ভালোবাসে। পড়াশোনার সময় সব সময় সঙ্গে পায় বাবা, দিদি, দাদা ছাড়াও স্কুলের শিক্ষকদের।

উত্তরণ-এর মুখোমুখি হয়ে কীভাবে পড়াশোনা করে, আগামী দিনে তার কী স্বপ্ন সবকিছুই শেয়ার করল অলঙ্কার।

উত্তরণ: দিনে কতক্ষণ পড়ো?

অলঙ্কার: সাত থেকে আট ঘণ্টা। ভোর পাঁচটায় ঘুম থেকে উঠি। তারপর যেদিন টিউশন থাকে সেদিন যাই। না হলে ঘরেই পড়াশোনা করি।

উত্তরণ: এখন দশম শ্রেণি, মানে সামনেই মাধ্যমিক। ওই সময় কি পড়াশানার সময় আরও বাড়বে?

অলঙ্কার: হ্যাঁ, আরও বেশি সময় পড়তে হবে। এখন শর্ট কোয়েশ্চেন বেশি। তাই প্রতিটি বই খুব ভালোভাবে খুঁটিয়ে পড়ি। রেফারেন্স বইগুলোও পড়ছি।

উত্তরণ: মাধ্যমিকে কীরকম রেজাল্ট আশা করছ?

অলঙ্কার: ভালো রেজাল্ট করার জন্য ভালো করে পড়াশোনা করব।

উত্তরণ: কোন কোন বিষয়ে টিউশন নাও?

অলঙ্কার: চারটে বিষয় টিউশন নিই। জীবনবিজ্ঞান, ভৌতবিজ্ঞান, অঙ্ক ও ইংরেজি। বাকি বিষয়গুলো নিজে পড়ি।

উত্তরণ: তোমার প্রিয় বিষয় কী?

অলঙ্কার: জীবনবিজ্ঞান ও অঙ্ক।

উত্তরণ: অঙ্ক করার জন্য কতখানি সময় দাও?

অলঙ্কার: তিন ঘণ্টা।

উত্তরণ: পড়া মনে রাখার জন্য কী করো?

অলঙ্কার: যে বিষয়টি পড়ছি সেই বিষয়টি একটু ভেবে নিই। তারপর পড়ার পর লিখি।

উত্তরণ: পড়াশোনার পাশাপাশি আর কী ভালো লাগে?

অলঙ্কার: ক্রিকেট খেলতে ভালো লাগে। অ্যাডভেঞ্চার গল্পের বই পড়তে, টিভিতে কার্টুন দেখতেও ভালো লাগে।

উত্তরণ: বড় হয়ে কী হতে চাও?

অলঙ্কার: চিকিৎসক।

উত্তরণ: তোমার জন্য অনেক অনেক শুভেচ্ছা থাকল।

যুগশঙ্খ
SUPPLI
মঙ্গলবার, ২৯ আগস্ট ২০১৭

ক্রিকেটের ইতিবৃত্ত

ক্রিকেট একটি জনপ্রিয় খেলা এবং আমাদের প্রায় সবারই খুব ফেভারিট। এই ক্রিকেটের আসল উৎপত্তি কবে কোথায় হয়েছিল, তা এখনও এক রহস্য। তবে বেশিরভাগ অনুসন্ধানই বলছে ক্রিকেটের জন্ম ইংল্যান্ডে। মোটামুটি বলা যায় যে পঞ্চদশ শতকের আগে থেকেই দক্ষিণ-পূর্ব ইংল্যান্ডের কেন্ট, সাসেক্স ও সারি কাউন্টিগুলিতে, বিশেষ করে Weald নামের অঞ্চলটিতে ক্রিকেটের প্রচলন ছিল। ব্যাট-বল-ফিল্ডার দিয়ে খেলা হত। বিভিন্ন রকম খেলার থেকে ক্রিকেটের একটা আলাদা বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, এটি খেলার জন্য অপেক্ষাকৃত ছোট দৈর্ঘ্যের ঘাসবিশিষ্ট মাঠের প্রয়োজন হত, কারণ সপ্তদশ শতকের আগে পর্যন্তও ব্যাটসম্যানকে মাটিতে গড়িয়ে বল করা হত। একারণে যে সমস্ত জায়গায় বনাঞ্চল সাফ করা হয়েছিল, কিংবা ভেড়া চরানো হতো, সেই সমস্ত জায়গাই ক্রিকেট খেলার জন্য উপযোগী ছিল। ক্রিকেটের শুরুর দিকের বছরগুলির যথাযথ তথ্য না পাওয়ার কারণে ধারণা করা হয় যে, এটি ক্রিকেট খেলার চেয়ে ক্রিকেটকে কেন্দ্র করে জুয়া খেলার সুযোগই তাদের বেশি আকৃষ্ট করেছিল। ক্রমে ক্রিকেটে প্রচুর বিনিয়োগ হওয়া শুরু হয় এবং লন্ডন ও দক্ষিণ ইংল্যান্ডে এটি একটি জনপ্রিয় বিনোদনে পরিণত হয়। এসময় বড় বড় ক্লাব ও পেশাদার ক্রিকেট খেলোয়াড়ের আবির্ভাব ঘটে।

ফুটবলের মতোই ক্রিকেটের জনক কে তা নিয়েও রয়েছে বিভিন্ন মত। তবে বেশিরভাগ মতই বলছে, ক্রিকেটের জন্ম হয় ইংল্যান্ডে। কিন্তু বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা যায় ক্রিকেটের প্রচলনটা শুরু হয় ভারতীয় উপমহাদেশের পঞ্জাব অঞ্চলের 'দোয়াব' এলাকায়। সপ্তম শতাব্দীতে এই এলাকায় ব্যাট এবং বল নামে একধরনের খেলা হত। তাদের মাধ্যমে অষ্টম শতাব্দীর আরও কিছু পরের সময়ে খেলাটি পারস্যের দিকে প্রচলিত হতে থাকে। ইউরোপে খেলাটির প্রচলন সম্পর্কে জানা যায়, দশম শতাব্দীর আগে প্রাচীন ভারতীয় মরুভূমিতে বসবাসকারী নরম্যাডিক জিপসিরা তুরস্ক হয়ে ইউরোপে যায় এবং সেখানে গিয়ে তারা তাদের

আসলে সম্ভবত ছোট বাচ্চাদের খেলা ছিল। সপ্তদশ শতকে এসে শ্রমিকেরা এটি খেলা শুরু করে। রাজা প্রথম চার্লসের সময় অভিজাত শ্রেণি খেলাটির প্রতি আকৃষ্ট হতে শুরু করে। মধ্যে প্রচলিত এই খেলাটি খেলে। তাদের দেখাদেখিই ইউরোপীয়দের মধ্যে খেলাটির প্রচলন হয়। বল নিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধরনের খেলা প্রচলিত ছিল। তবে বলের সাথে ব্যাটের উদ্ভব হয়েছে দক্ষিণ ভারতে। সেখানে ব্যাটকে 'ডান্ডা' বলা হতো।

১০৬৬ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ড বিজয়ের পর নরম্যানরা চিত্ত-বিনোদনের জন্য ব্যাট-বলের খেলার ধারণাটি গ্রহণ করে। তাদের হাত ধরেই গোড়াপত্তন হয় ক্রিঘ (creagh) বা ক্রিকে (cricke) নামক খেলার। সে সময় শুধুমাত্র সপ্তাহের একটি দিন, রবিবার এই খেলাটি খেলা হত। খেলাটির ধরন ছিল এরকম, একটি বল একজন ব্যাটসম্যানের দিকে ছুড়ে মারা হত। ব্যাটসম্যানের ঠিক পিছনেই আজকের স্ট্যাম্পের মতো একধরনের কাঠামো থাকত। ব্যাটসম্যান সেই কাঠামোকে বলের আঘাত থেকে বাঁচানোর জন্য তার হাতে থাকা কাঠের তক্তা দিয়ে বলটিকে বাড়ি মারত। ব্যাটসম্যানের বাড়ি মারা বলটিকে ধরার জন্য তার চারপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে কয়েকজন ফিল্ডারও থাকত।

আধুনিক ক্রিকেটের পথচলা শুরু হয় কাউন্টি ম্যাচের মাধ্যমে। ১৭১৯ সালে ইংল্যান্ড জাতীয় দল ও কেন্ট দলের ম্যাচের মাধ্যমে। ১৭২১ সালে ভারতবর্ষে আধুনিক ক্রিকেটের প্রচলন হয় ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির মাধ্যমে। তবে ১৭৪৪ সালের আগে ক্রিকেট পুরোপুরি আধুনিক হয়ে উঠেনি। কেননা সে সময়ও নিয়মকানুন মেনে ক্রিকেট খেলা হতো না। ১৭৪৪ সালে আধুনিক ক্রিকেটের বিভিন্ন নিয়মকানুন করা হয় এবং সেই নিয়ম মোতাবেক ক্রিকেট খেলা শুরু হয়।

১৮৭৭ সালে এসে জন্ম হয় টেস্ট ক্রিকেটের। ক্রিকেট ইতিহাসের প্রথম টেস্ট ম্যাচে অংশগ্রহণ করে ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া। ১৮৭৭ সালের ১৫ মার্চ ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম ওয়ান ডে ম্যাচেও অংশগ্রহণ করে এই দুটি দল। দুই ম্যাচেই অস্ট্রেলিয়া জয়লাভ করে। বিশ্ব ক্রিকেটের সর্বোচ্চ সংস্থা হিসেবে 'ইম্পেরিয়াল ক্রিকেট কনফারেন্স' প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯০৯ সালে। পরে ১৯৫৬ সালে 'ইম্পেরিয়াল' কথাটি পরিবর্তন করে 'ইন্টারন্যাশনাল' শব্দটি যোগ করে 'ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিল' রাখা হয়। সংক্ষেপে আইসিসি। ১৮৮২-৮৩ সাল থেকে শুরু হয় মর্যাদাপূর্ণ অ্যাশেজ লড়াই। এরপর থেকে অন্যান্য দেশ টেস্ট ক্রিকেটে একে একে পদার্পণ করে। দক্ষিণ আফ্রিকা ১৮৮৮-৮৯, ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১৯২৮, নিউজিল্যান্ড ১৯২৯-৩০, ভারত ১৯৩২, পাকিস্তান ১৯৫২-৫৩, শ্রীলঙ্কা ১৯৮১-৮২, জিম্বাবোয়ে ১৯৯২ এবং বাংলাদেশ ১৩ নভেম্বর, ২০০০।

প্রথমদিকে টেস্ট ম্যাচগুলো অনেক দিন ধরে চলত। কারণ, এখনকার মতো নির্দিষ্ট কোনও দিনের হিসাব ছিল না। তখন ম্যাচ দেখার জন্য প্রচুর দর্শক হতো। এই সময়েই টিকিট কেটে খেলা দেখার প্রচলন শুরু হয়। কিন্তু বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে অনির্দিষ্ট দিন ধরে চলতে থাকা এই খেলা প্রায়ই বন্ধ থাকত। এই নিয়ে আয়োজক ও দর্শকদের মধ্যে গণ্ডগোল শুরু হয়। একই সঙ্গে কমতে থাকে ক্রিকেটের দর্শক। ক্রিকেট মাঠে দর্শক ফিরিয়ে আনা ও আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্যে রাগনেল হার্ভের উদ্যোগে রথম্যানস কো. ৪০ ওভারের একটি টুর্নামেন্ট আয়োজন করে। খেলা হত রবিবার। তাতে খেলতেন কাউন্টি দলগুলোর বিপক্ষে চলতি ও প্রাক্তন তারকা খেলোয়াড়দের যৌথ উদ্যোগে গড়া ইন্টারন্যাশনাল কার্ভেলিয়ার্স। এই উদ্যোগের অভূতপূর্ব সাফল্য মেলে। ফলে যেসব দর্শক তিনদিনের ফলাফলবিহীন অসমাপ্ত ম্যাচ না দেখার জন্য মাঠ ত্যাগ করেছিলেন, তারাই সকাল-বিকালের ম্যাচে জয়-পরাজয় প্রত্যক্ষ করার জন্য মাঠে আসতে শুরু করেন।

বিশ্ব ক্রিকেটের সর্বোচ্চ সংস্থা 'আইসিসি' ক্রিকেট খেলে এমন সবগুলো দেশ একসঙ্গে নিয়ে নতুন এক টুর্নামেন্টের চিন্তা করে। সেই চিন্তাভাবনা থেকেই ১৯৭৫ সালের ৭ জুন প্রথম বিশ্বকাপ ক্রিকেটের পর্দা ওঠে। প্রথম বিশ্বকাপ ক্রিকেটের আয়োজক ছিল ইংল্যান্ড এবং সেই টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করে আহবায়ক ইংল্যান্ড, পূর্ব আফ্রিকা, শ্রীলঙ্কা, অস্ট্রেলিয়া, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ভারত, পাকিস্তান ও নিউজিল্যান্ড। ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে খেলে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ওই ম্যাচে অস্ট্রেলিয়াকে ১৭ রানের ব্যবধানে পরাজিত করে ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথম বিশ্বকাপ জয়ের গৌরব অর্জন করে। এতে ম্যান অব দ্য ম্যাচ হয়েছিলেন ক্লাইভ লয়েড। এইভাবেই শুরু হয়েছিল ক্রিকেটের জয়যাত্রা। আর এখন তো ওয়ান ডে ম্যাচ, টেস্ট ছাড়াও শুরু হয়েছে কুড়ি ওভারের টি টোয়েন্টি, মিনি বিশ্বকাপ,আইপিএল— কত কিছু। রকমারি নাম, উন্মাদনা কত কিছু। তবুও ক্রিকেটের জনপ্রিয়তায় ভাঁটা পড়তে কিন্তু দেখা যায় না।

অভিষেক সেন

প্রকৃতিকে ভালোবাসা

প্রথম পাতার পর

বা কারওকে দোষ দিয়ে লাভ নেই যে কেন পরিষ্কার করা হয় না। আমরা নিজেরা এই ব্যাপারে কতটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন সেই প্রশ্ন আমাদের নিজেদের করা উচিত। কারণ প্রচার থাকলেও এ ব্যাপারে সমাজ এখনও সেইভাবে সচেতন নয়। বেশিরভাগ মানুষের কাছে নিজের ঘরটা পরিষ্কার রাখাটাই মূল বিষয়, কিন্তু তার বাইরে পৃথিবীর কথা নিয়ে তারা চিন্তিত নন। তাই যত্রতত্র ময়লা আবর্জনা থেকে দূষণ বাড়ছে। বনভোজন বা অন্য কোথাও বেড়াতে গিয়ে চিপস, প্লাস্টিকের জলের বোতল আমরা যেখানে সেখানে ফেলে দিই। ডাস্টবিনে ময়লা ফেলার অভ্যাসও আমাদের কম। প্রথমত নিজেরা যত্রতত্র ময়লা ফেলবেন না। শিশুকেও ফেলতে নিষেধ করবেন। পড়ে থাকতে দেখলে শিশুরা যেন নিজেরাই সেগুলো তুলে নিয়ে ডাস্টবিনে ফেলে। এতে তাদের মধ্যে দায়িত্ববোধও তৈরি হবে। তবে শিশুদের শেখানোর আগে বড়দের শেখা উচিত। রাস্তাটা পরিষ্কার রাখার দায়িত্ব আমাদের, সেটা সকলকে বুঝতে হবে।

প্রকৃতির সঙ্গে শিশুদের সম্পর্ক গড়ে তুলতে সাহায্য করুন। শুধু মুখে বলে সব সময় সবকিছু শেখানো যায় না। শিশুদেরও উপলব্ধি ক্ষমতা আছে। ছুটির দিনে বা সময় পেলে ওদের নিয়ে প্রকৃতির কাছে নিয়ে যান। আমরা একটু সচেতন হলে গাছ ভালো থাকবে, আমরা ভালো থাকব। সেগুলো বোঝাতে হবে। দূরে কোথাও যাওয়ার সুযোগ না থাকলে ঘরের কাছের কোনও পার্ক বা মাঠে নিয়ে যেতে পারেন, যেখানে সবুজের সমারোহ আছে। নিজেদের ঘর লাগোয়া বাগান থাকলে বা ছাদের এক কোণে ছোট ছোট ফুলের গাছ লাগাতে পারেন। ছোট থেকেই একটি শিশুর মধ্যে পরিবেশের প্রতি সচেতনতা গড়ে ওঠার পাশাপাশি সে প্রকৃতিকে ভালোবাসতে শিখবে।

যুগশঙ্খ SUPPLI
মঙ্গলবার, ২৯ আগস্ট ২০১৭

স্পেশাল টিউশন: বাংলা ব্যাকরণ

কারক

অধিকরণ কারক

যে পদ ক্রিয়াপদের আধারকে প্রকাশ করে ক্রিয়াপদের সঙ্গে সেই পদের সম্পর্ককে অধিকরণ কারক বলে।

যেমন: নদীতে বান এসেছে। কোথায় বান এসেছে? নদীতে। তাই নদীতে অধিকরণ কারক।

বনের পশুরা দিনে ঘুমোয় ও রাতে জাগে। কখন ঘুমোয় ও কখন জাগে? দিনে ও রাতে। এখানে দিনে ও রাতে অধিকরণ কারক।

শ্যামল গণিতে কাঁচা। কীসে কাঁচা? গণিতে। গণিতে অধিকরণ কারক। ক্রিয়ার আধারকে অধিকরণ বলে।

অধিকরণ কারক প্রধানত তিন রকম— ১) আধারিধকরণ, ২) কালাধিকরণ এবং বিষয়াধিকরণ বা ভাবাধিকরণ।

১) আধারিকরণ: আধারিকরণ কয়েক রকমের হতে পারে। যেমন— অভিব্যাপক, ঐকদেশিক ও ব্যাপ্তি সামীপ্য।

অভিব্যাপক: সমস্ত স্থান বা দেশ জুড়ে আছে বোঝালে অভিব্যাপক অধিকরণ হয়। যেমন— তিলে তেল আছে। আগুনে দাহিকাশক্তি আছে।

ঐকদেশিক: স্থানের একাংশে থাকলে ঐকাদেশিক অধিকরণ হয়। যেমন— আগ্রায় তাজমহল আছে। বনে বাঘ আছে।

সামীপ্যাধিকরণ: স্থানের সমীপে বা নিকটে আছে বোঝালে সামীপ্যাধিকরণ হয়। যেমন— দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ি।

স্থানের ব্যাপ্তি: কতটা স্থান জুড়ে আছে বোঝাতে স্থানের ব্যাপ্তি হয়। যেমন— রাস্তায় জল থইথই করছে।

২) কালাধিকরণ: সময় বা কাল বোঝালে কালাধিকরণ হয়। যেমন— তাঁরা সন্ধ্যায় আসবেন। বর্ষাকালে নদীতে বন্যা হয়।

সময়ের ব্যাপ্তি বোঝাতেও কালাধিকরণ হয়। যেমন— বর্ষাকালে আকাশে কালো মেঘ দেখা যায়।

৩) বিষয়াধিকরণ বা ভাবাধিকরণ: কোনও বিষয় বোঝালে বিষয়াধিকরণ হয়। যেমন— সে বুদ্ধিতে সকলের সেরা। তার পড়াশোনায় মন নেই।

অ-কারক সম্পর্ক (সম্বন্ধ ও সম্বোধন)

সম্বন্ধ পদ: বাক্যের মধ্যে ক্রিয়ার সঙ্গে যেসব বিশেষ্য ও সর্বনামের সম্পর্ক থাকে, সেগুলি কারক। কিন্তু বাক্যের মধ্যে এমন বিশেষ্য বা সর্বনাম থাকতে পারে, যার সঙ্গে ক্রিয়ার কোনও সম্পর্ক নেই, কিন্তু অন্য বিশেষ্যের সঙ্গে সম্পর্ক আছে। যেমন— গঙ্গার তীরে অনেক শহর আছে। 'গঙ্গার' এই বিশেষ্য পদের সঙ্গে 'তীরে' এই বিশেষ্য পদের সম্বন্ধ আছে। তাই গঙ্গার হল সম্বন্ধ পদ। সম্বন্ধ পদ র, এর, দের প্রভৃতি বিভক্তির সাহায্যে গঠিত হয়। বিশেষ্য পদ ও সর্বনাম পদই সম্বন্ধ পদ রূপে ব্যবহৃত হয়।

সম্বন্ধ পদের শ্রেণিবিভাগ:

বহু প্রকারের সম্বন্ধ পদ হয়। কারক ছ'প্রকারের বলে ক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক না থাকলে ছ'প্রকারের কারকের সম্বন্ধ পদ হয়। যেমন—

১) কর্তৃ সম্বন্ধ: কর্তৃ কারকের সঙ্গে সম্বন্ধ বোঝাতে কর্তৃ সম্বন্ধ হয়। যেমন— কাজির বিচার। দেবতার গ্রাস।

২) কর্ম সম্বন্ধ: কর্মের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকলে কর্ম সম্বন্ধ হয়। যেমন— অতিথির আপ্যায়ন।

৩) করণ সম্বন্ধ: কোনও কিছুর দ্বারা বোঝাতে করণ সম্বন্ধ হয়। যেমন— কলমের খোঁচা। হাতের কাজ।

৪) নিমিত্ত সম্বন্ধ: কোনও কিছুর জন্য বোঝালে নিমিত্ত সম্বন্ধ হয়। যেমন— ঠাকুরের নৈবেদ্য।

৫) অপাদান সম্বন্ধ: ভীত, উৎপন্ন, পতিত, বিশ্লিষ্ট বোঝাতে অপাদান সম্বন্ধ হয়। যেমন— ঘরের বাইরে। বাঘের ভয়।

৬) অধিকরণ সম্বন্ধ: কোনও স্থান, সময় বা বিষয় বোঝাতে অধিকরণ সম্বন্ধ হয়। যেমন— বনের বাঘ। খাঁচার পাখি।

এছাড়াও সম্বন্ধ পদ নানা ধরনের হতে পারে। যেমন—

১) অধিকার বা স্বামীত্ব সম্বন্ধ: কোনও কিছুর ওপর কারোর অধিকার বা দখল বোঝালে সেই সম্বন্ধকে অধিকার বা স্বামীত্ব সম্বন্ধ বলা হয়। যেমন— আমার মা। রামের রাজ্য।

২) সাধারণ বা সামান্য সম্বন্ধ: দুটি বস্তু বা শব্দের মধ্যে সাধারণভাবে কোনও সম্বন্ধ থাকলে তখন সাধারণ সম্বন্ধ বা সামান্য সম্বন্ধ হয়। যেমন— বানের জল। সোনার তাল।

৩) কার্য-কারণ সম্বন্ধ: কোনও কিছুর জন্য কিছু ঘটলে, সেক্ষেত্রে তার সম্বন্ধ বোঝাতে কার্য-কারণ সম্বন্ধ হয়। যেমন— ঘায়ের ব্যথা। বিদ্যুতের আলো।

৪) জন্য-জনক সম্বন্ধ: কোনও বস্তুর সঙ্গে যদি কোনও বস্তুর জন্মগত বা উৎপত্তিগত কোনও সম্বন্ধ থাকে, তখন সেই সম্বন্ধকে জন্য-জনক সম্বন্ধ বলে। যেমন— সরষের তেল।

৫) অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ: কোনও কিছুতে কারও অঙ্গ বা অংশের সম্বন্ধ বোঝালে তাতে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ হয়। যেমন— হাতির শুঁড়।

৬) উপাদান সম্বন্ধ: কোনও কিছুর সঙ্গে কোনও কিছুর উপাদানগত সম্বন্ধ বোঝালে তাতে উপাদান সম্বন্ধ হয়। যেমন— কাঠের দরজা। মাটির প্রতিমা।

৭) উপমা বা রূপক সম্বন্ধ: কোনও কিছুর সঙ্গে কোনও কিছুর উপমা বা রূপক সম্বন্ধ বোঝালে সেই সম্বন্ধকে উপমা বা রূপক সম্বন্ধ বলে। যেমন— জ্ঞানের আলো। শোকের আগুন।

৮) বিশেষণ সম্বন্ধ: কোনও সম্বন্ধ পদ বিশেষণের মতো পরবর্তী পদের গুণ, ধর্ম ইত্যাদি প্রকাশ করলে সেই সম্বন্ধকে বিশেষণ সম্বন্ধ বলে। যেমন— খুশির গান।

৯) তারতম্যবাচক সম্বন্ধ: তারতম্য বোঝবার জন্য চেয়ে, অপেক্ষা পদগুলির সাহায্যে গঠিত যে সম্বন্ধ প্রকাশ পায় তাকে তারতম্যবাচক সম্বন্ধ বলে। যেমন— তোমার চেয়ে। আমার অপেক্ষা।

১০) ব্যাপ্তি সম্বন্ধ: যে সম্বন্ধ দিয়ে কিছু কাল ধরে ব্যাপ্ত বোঝানো হয় তাকে ব্যাপ্তি সম্বন্ধ বলে। যেমন— তিনদিনের ছুটি। সাতদিনের সপ্তাহ।

জেনে রাখো

পোস্টমর্টেমের বাংলা ময়নাতদন্ত, কিন্তু কেন?

প্রায়ই খবরের কাগজে বা টিভির পর্দায় কোনও খুনের ঘটনা বা আকস্মিক মৃত্যুতে আমরা একটা জিনিস শুনে অভ্যস্ত, সেটা হল ময়নাতদন্ত। যার ইংলিশ নাম পোস্টমর্টেম। এই শব্দটা আমরা সকলেই জানি। কোন ক্ষেত্রে এই কথাটা ব্যবহার করা হয় সেটাও জানি। কিন্তু এই নামের পিছনে ঠিক কী অর্থ আছে, সেটা আমরা অনেকেই ভেবে দেখি না। কেন পোস্টমর্টেমকে ময়নাতদন্ত বলা হয়, সেটা নিয়েও হয়তো আমরা মাথা ঘামাই না। এই বিষয়টা নিয়ে হয়তো কেউই তেমন ভেবে দেখে না। যে নামটি নিজেই রহস্যের কিনারা করে থাকে, তার নামের পিছনে রহস্যটি কী সেটি জানা দরকার।

আমরা জানি যে, পোস্টমর্টেম একটি খুনের অজানা কারণকে উদ্ঘাটন করা হয়। কীভাবে বা কী কারণে খুন হয়েছে সেটি জানার জন্যই মূলত পোস্টমর্টেম বা ময়নাতদন্ত করা হয়ে থাকে। আসলে অন্ধকার বা অজানা তথ্য জানার জন্যই এটি করা হয়।

তবে এর পিছনে আসল কারণটি হল ময়না দেখতে মিশমিশে কালো। যদিও এর ঠোঁট হলুদ। এরা ৩ থেকে ১৩ রকমভাবে ডাকতে পারে। অন্ধকারে ময়না দেখা প্রায় দুষ্কর। অন্ধকারের কালোয় নিজেকে লুকিয়ে রাখে ময়না। কেবলমাত্র অভিজ্ঞ মানুষ তার ডাক শুনে বুঝতে পারেন, এটা ময়না পাখির ডাক। অন্ধকারে না দেখা ময়নাকে যেমন অন্ধকারে শুধু কণ্ঠস্বর শুনেই আবিষ্কার করা যায়, ঠিক তেমনি পোস্টমর্টেমও অজানা কারণ বা অন্ধকারে থাকা কারণকে সামান্য সূত্র ধরে আবিষ্কার করা যায়।

সামান্য সূত্র হতে শেষ পর্যন্ত আবিষ্কার হয় বড় কোনও অজানা রহস্যের। খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয় প্রকৃত অপরাধীদের। সে কারণেই পোস্টমর্টেমের বাংলা নাম ময়নাতদন্ত।

এডু অ্যাডভাইস

নিয়ম করে পড়তে বসো

আমাদের ছোটবেলায় আমরা একটা নিয়মে বেঁধে চলেছি। সে নিয়মের মধ্যে একটি প্রধান নিয়ম ছিল সকাল-সন্ধ্যায় নিয়ম করে পড়তে বসা। বাড়ির সব ভাইবোনেরা বড়দের তত্ত্বাবধানে পড়াশোনা শেষ করেছে। আর শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের মেজদার কঠোর নিয়মশৃঙ্খলায় পড়ার গল্প তো আমরা সবাই জানি।

এখন কিন্তু অবস্থাটা আর সেরকম নেই। পরিবার ভেঙে ছোট হয়ে গেছে। সামাজিক, অর্থনৈতিক পরিকাঠামো বদলেছে আর সবচেয়ে বেশি বদলেছে ছোটদের জীবন। জীবনের চাপে তারা জর্জরিত হয়ে পড়েছে। বাবা-মায়েরাও নিজেদের জীবনে ব্যস্ত যার ফলে তাদের সকাল-সন্ধে আর মায়ের মিষ্টি আদর বা বাবার শাসন পাওয়াটা দুষ্কর। এর ফলে ক্ষতি কিন্তু বাচ্চাদেরই হচ্ছে। তাদের পড়ার কোনও বাঁধাধরা নিয়ম বা সময় থাকছে না। কিন্তু এটা কখনোই ঠিক নয়। একজন বাচ্চার জীবনে সময়ের কাজ সময়ে করাটা অবশ্যই জরুরি।

তাই মায়েরা নজর দিন। মায়েদের প্রতিদিনের কাজের মধ্যে একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল বাচ্চাদের পড়াতে বসানো। বাচ্চারা বড় হলে কেবল তাদের স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিলেই দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না, বরং স্কুলের পড়াগুলো ঠিকমতো তৈরি করতে বাচ্চাকে সাহায্য করা ও তার পড়াশোনার প্রতি সঠিক মনোযোগ স্থাপনে সাহায্য করতে একজন অভিভাবক হিসেবে মায়ের দায়িত্ব অনেক।

শুধু যে একটি নির্দিষ্ট রুটিন মাফিক আপনার বাচ্চাকে পড়াতে বসালেই আপনার বাচ্চা ঠিকমতো পড়বে এমনটা নয়। আপনাকেও এমন কোনও ভালো উপায় খুঁজে বের করতে হবে যাতে আপনার বাচ্চা পড়তে বসতে আগ্রহী হয়ে ওঠে ও তার পড়ার সময়টুকু বাচ্চা সম্পূর্ণভাবে উপভোগ করে।

বাচ্চাকে পড়াতে বসানোর একটি নির্দিষ্ট রুটিন তৈরি করুন। পড়াতে বসানোর জন্য প্রথমে যা করতে হবে তা হল একটি নির্দিষ্ট সময়সূচি অনুসরণ করা। তবে মনে রাখতে হবে টাইম টেবিলটা হবে শিশু কখন পড়তে বসতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছে তার উপর নির্ভর করে। আপনি যদি আপনার সময় অনুযায়ী আপনার বাচ্চার পড়ার সময় বাছাই করেন এতে আপনার বাচ্চার পড়ার প্রতি আগ্রহ কমতে থাকবে।

বাচ্চাকে পড়তে উৎসাহী করতে প্রশংসা করুন। এখন যেটা একদমই বাবা-মায়েরা করেন না। বরং অন্য বাচ্চার তুলনা দিয়ে নিজের বাচ্চার উপর

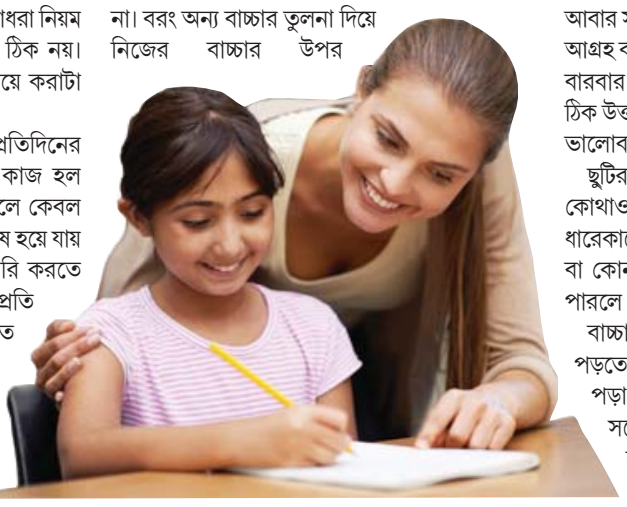

অতিরিক্ত প্রেশার তৈরি করেন। কিন্তু এরকমটা না করে আপনার বাচ্চার পড়ার গতি ও মনোযোগ উভয়ই বাড়াতে তাকে তার পড়ার ভালো ফলাফলের জন্য প্রশংসা করুন। সে কোনও বিষয়ে ভালো অগ্রগতি দেখালে স্বতস্ফূর্তভাবেই আনন্দ প্রকাশ করুন।

বাচ্চারা একা একা পড়ার থেকে সাথী নিয়ে পড়তে বেশি পছন্দ করে। আর তাই অভিভাবকেরা বাচ্চাকে পড়াতে বসিয়ে চুপচাপ না থেকে বাচ্চার সঙ্গে নিজেরাও থাকুন। এতে আপনার বাচ্চা দ্রুত পড়া আয়ত্ব করতে পারবে।

পড়া যাতে একঘেঁয়েমিতে পরিণত না হয় তা নিশ্চিত করতে বাচ্চার সঙ্গে পড়ার ফাঁকে ফাঁকে খেলায় অংশগ্রহণ করুন। হতে পারে সেটা পড়া বিষয়কই কোনও খেলা, যার মাধ্যমে বাচ্চা খেলতেও পারবে আবার সঙ্গে সঙ্গে পড়াটাও তৈরি হবে। শিশুর জানার আগ্রহ বাড়িয়ে তুলতে পড়ার ফাঁকে তাকে জানা বিষয়ে বারবার প্রশ্ন করতে হবে। আর বাচ্চা যদি প্রশ্নের ঠিক ঠিক উত্তর দেয় তাহলে তার প্রশ্নের উত্তরের বিপরীতে ভালোবাসা আর আদর দিন।

ছুটির দিনগুলিতে পড়াশোনার পাশাপাশি কাছাকাছি কোথাও শিক্ষণীয় ভ্রমণে নিয়ে যেতে পারেন। টুক করে ধারেকাছে বাচ্চার মনের মতো জায়গায় ঘুরিয়ে আনলে বা কোনও বিষয়ে তার মনে জিজ্ঞাসা তৈরি করতে পারলে তা পড়াশোনার ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ হবে।

বাচ্চারা যদি ভিডিও গেমস খেলতে ভালোবাসে, পড়তে পড়তে ক্লান্ত বোধ করলে না হয় একটু খেলল। পড়া মানে কাঠের পুতুলের মতো শুধুই পড়া নয়। সঙ্গে বাচ্চার মনোরঞ্জনেরও সব ব্যবস্থা রাখতে হবে। তবেই তার ভবিষ্যতে পড়ার প্রতি আরও আগ্রহ তৈরি হবে।

যুগশঙ্খ SUPPLI
মঙ্গলবার, ২৯ আগস্ট ২০১৭

যুগশঙ্খ SUPPLI team
উত্তরণ
শর্মিলা চন্দ্র (কো-অর্ডিনেটর ও সাব-এডিটর), **তন্ময় মণ্ডল** (সাব-এডিটর), **বিদিশা রায়চৌধুরী** (অসম), **সালমা আহমেদ, বিপাশা চক্রবর্তী**

ক্লাস সেভেন-এর টিউশন: ভূগোল

মাটি দূষণ

এই পৃথিবীর তিনভাগ জল ও একভাগ স্থল। এই স্থলভাগের মূল হল মাটি। স্থলভাগের উপরের স্তরে থাকে মাটি। কয়েক হাজার বছর ধরে প্রাকৃতিক শক্তির কারণে শিলা ক্ষয় পেয়ে মাটি তৈরি হয়। আমাদের এই উদ্ভিদ ও প্রাণী জগৎকে মাটি ধারণ করে আছে। মানুষ, উদ্ভিদ ও অন্যান্য প্রাণিজগতের বাসস্থান থেকে শুরু করে খাবার সংস্থান ও জীবন সবটাই মাটিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে।

তবে, ইদানীংকালে মাটি দূষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, একটি গাছের টবের মাটিতে যদি বিষাক্ত কিছু মিশিয়ে দেওয়া হয় তবে গাছটি কয়েকদিনের মধ্যে মারা যাবে। আমাদের পৃথিবীর মোট স্থলভাগের মাত্র ১০ শতাংশের মধ্যে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার ৯০ শতাংশ মানুষ বাস করেন। মানুষের সচেতনতার অভাবে এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপে মাটির অতিরিক্ত ও অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের ফলে মাটির ক্ষয় এবং দূষণ হচ্ছে ব্যাপক হারে।

মাটি দূষণের উৎস সন্ধান করলে যে-কটি মূল কারণ চোখে পড়ে তা হল—

১) **নগরায়ন:** জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বাসস্থানের চাহিদাও বেড়েছে, আর সঙ্গে বেড়েছে বৃক্ষচ্ছেদন। এর জন্য মাটির ক্ষয় হয়ে হচ্ছে মাটি দূষণ।

২) **কৃষিকাজ:** জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য খাদ্যের প্রয়োজন বৃদ্ধি পেয়েছে ফলে বাড়াতে হয়েছে উৎপাদন। উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার হয় প্রচুর পরিমাণে, যার কারণে খাদ্যের গুণ নষ্ট

হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাটির পোকামাকড় মারা যায়, জৈবপদার্থের অভাব দেখা দেয় এবং মাটির গুণমান নষ্ট হয়। আবার কখনও একই শস্যের বহুবার চাষের জন্য মাটির উর্বরতা নষ্ট হয়।

৩) **শিল্প উপাদান:** জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদার জন্য যেমন শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমনি কারখানার বর্জ্য মাটি ভূগর্ভস্থ জলকে করছে দূষিত। শুধু তাই নয় কারখানার বিষাক্ত গ্যাস বাতাসে মিশে অ্যাসিড বৃষ্টি হয় যা মাটিতে মিশে মাটিকে করে তোলে বিষাক্ত।

৪) **গৃহস্থালি:** বাড়ি, বাজার, হাসপাতালের আবর্জনাস্তূপে নানারকম ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস জন্মায়, শৌচাগারের মলমূত্র মাটিতে মিশলে নানারকম জীবাণু সৃষ্টি করে। প্লাস্টিক আবার মাটিতে মিশতে চায় না, এর বিষাক্ত মাটিকে দূষিত করে।

৫) **যানবাহন:** দিন দিন যানবাহন যেভাবে বেড়ে চলেছে তার সঙ্গে বেড়ে চলেছে তার বিষাক্ত ধোঁয়া। ফলে দূষিত হচ্ছে বায়ু এবং তা থেকে হচ্ছে মাটি দূষণ।

৬) **তাপবিদ্যুৎ ও পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র:** তাপবিদ্যুৎ ও পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের ছাই, তেজস্ক্রিয় পদার্থ মাটিতে মিশে মাটির ক্ষতি যেমন করে তেমনই তা ফসলের মধ্যে ঢুকে মানুষের শরীরে রোগ সৃষ্টি করছে। আবার ইটভাটার ইট তৈরির জন্য অতিরিক্ত মাটি কাটার জন্য মাটি ক্ষয়ও হচ্ছে।

১৯৮৪ সালের ডিসেম্বরে একদিন মাঝরাতে ভারতের ভোপালে ইউনিয়ন কার্বাইডের কারখানা থেকে অতি বিষাক্ত গ্যাস বাতাসে মেশে। এর ফলে প্রচুর মানুষ মারা যায়। সুতরাং আমরা যদি এই বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে না দেখি তাহলে এরকম বিপদ আমাদের ভবিষ্যতেও হতে পারে। এর থেকে মুক্তি পেতে গেলে আমাদের মাটি দূষণ প্রতিরোধ করতে হবে, এর জন্য আমাদের পরিবেশ, তার উপাদান এবং আমাদের নিজেদের কাজকর্ম সম্পর্কে সচেতন হতে হবে।

১) এর জন্য আমাদের গৃহস্থালির আবর্জনা একটি নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলা উচিত। যেখানে-সেখানে আবর্জনা ফেললে দেখতে যেমন খারাপ লাগে, তেমনি মাটি দূষণের সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশ দূষণও হয়।

২) পলিথিনের বদলে কাগজ বা পাটের থলে ব্যবহার করা অনিবার্য।

৩) আমাদের বাড়ির উঠোন, বাগান, রাস্তার ধারে অনেক বেশি করে গাছপালা লাগানো দরকার। বর্তমানে যেহারে গাছ কাটা হচ্ছে তার প্রভাব ইতিমধ্যেই আমরা দেখছি গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের মধ্যে দিয়ে। সুতরাং এই বিষয়েও আমাদের সচেতন হতে হবে।

৪) কৃষিজমিতে রাসায়নিক সার কমিয়ে জৈব সারের পরিমাণ বাড়ানো প্রয়োজন।

৫) স্কুলের বা বাড়ির আশেপাশের মানুষকে এই বিষয়ে আরও সচেতন হতে হবে। কারণ সবাই মিলে এগিয়ে না আসলে এই বিপদের সঙ্গে একা লড়াই করা সম্ভব না।

৬) শৌচাগার ছাড়া যত্রতত্র মলমূত্র ত্যাগ করা বন্ধ করতে হবে। এই বিষয়ে সরকারও এখন সাহায্য করছে, শৌচাগার বানানো হচ্ছে সরকারি প্রচেষ্টায়। নানা ভাবে এই বিষয়ে মানুষকে সচেতনও করা হচ্ছে। সুতরাং তাদেরও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে পরিবেশের প্রতি।

ক্লাস এইট-এর টিউশন: বিজ্ঞান

ধাতু ও অধাতুর বৈশিষ্ট্য

মৌলের ধর্ম জানার জন্য তাদের বাহ্যিক ধর্মগুলি জানা দরকার, যাকে ভৌতধর্ম বলে। আবার কোনও পদার্থের অন্য পদার্থের সঙ্গে বিভিন্ন বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করার প্রবণতা ও ক্ষমতাকে ওই পদার্থের রাসায়নিক ধর্ম বলে।

ধাতু ও অধাতুদের উজ্জ্বলতা: ধাতুগুলি উজ্জ্বল ও চকচকে। আয়োডিন অধাতু হলেও উজ্জ্বল। অন্যান্য অধাতুগুলি অনুজ্জ্বল।

ধাতু ও অধাতুদের কাঠিন্য: সব ধাতুর কাঠিন্য একরকম নয়। পারদ ধাতু হলেও তরল এবং ব্রোমিন অধাতু হয়েও তরল। বেশিরভাগ অধাতু গ্যাসীয়। যেমন— অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন ইত্যাদি।

ধাতু ও অধাতুদের নমনীয়তা: ধাতুর নমনীয়তার জন্য ধাতুগুলিকে পিটিয়ে পাত বানানো যায়। সোনা ও রুপোর নমনীয়তা সবচেয়ে বেশি। অধাতুগুলির নমনীয়তা নেই, তাই অধাতু গুঁড়ো হয়ে যায়।

ধাতু ও অধাতুর প্রসারণশীলতা: সব ধাতুর প্রসারণশীলতা এক নয়। কিছু ধাতুর প্রসারণশীলতার জন্য ওইসব ধাতু থেকে তার তৈরি করা যায়। সোনার প্রসারণশীলতা বেশি হওয়ায় ১ গ্রাম সোনা থেকে ২ কিলোমিটার লম্বা তার তৈরি করা যায়।

ধাতু ও অধাতুর তাপ পরিবাহিতা: ধাতুগুলি তাপের সুপরিবাহী এবং আধাতুগুলি তাপের কুপরিবাহী। তবে গ্রাফাইট অধাতু হলেও তাপের সুপরিবাহী।

উপরোক্ত সমস্ত ভৌতধর্ম দিয়ে ধাতু ও অধাতুকে শনাক্ত করা যায় না, কারণ ধাতু ও অধাতুর ভৌতধর্মের নানা অমিল যেমন আছে তেমন মিলও আছে।

সাধারণ তাপমাত্রায় বেশিরভাগ ধাতু উচ্চ গলনাঙ্ক বিশিষ্ট কঠিন পদার্থ হলেও পারদ সাধারণ তাপমাত্রায় তরল। গ্যালিয়াম ও সিজিয়াম ধাতু হলেও এদের গলনাঙ্ক যথাক্রমে ২৯.৭৮°সেন্টিগ্রেড ও ২৮.৪°সেন্টিগ্রেট।

লিথিয়াম, সোডিয়াম, পটাসিয়াম ধাতু হলেও অন্য ধাতুদের মতো কঠিন না। অধাতুরা অনুজ্জ্বল হলেও, কেলাসিত আয়োডিনের উজ্জ্বলতা আছে। কার্বন অধাতু, কিন্তু বিভিন্নরূপে থাকতে পারে। একে কার্বনের রূপভেদ বলে। কার্বনের দুটি রূপভেদ হিরে ও গ্রাফাইট। হিরে উজ্জ্বল ও সবথেকে কঠিন প্রকৃতিজাত পদার্থ, কিন্তু তড়িতের কুপরিবাহী। গ্রাফাইট নরম ও পিচ্ছিল হলেও তাপ ও তড়িতের সুপরিবাহী। সুতরাং ধাতু ও অধাতুদের শনাক্ত করতে ভৌতধর্মই যথেষ্ট নয়। রাসায়নিক ধর্মও জানা প্রয়োজন।

ধাতু ও অধাতুগুলিকে বায়ুতে দহন করলে উৎপন্ন অক্সাইডের প্রকৃতি থেকে ধাতু ও অধাতু চেনা যায়। বেশিরভাগ ধাতব অক্সাইড ক্ষারকীয় ও বেশিরভাগ অধাতব অক্সাইড অ্যাসিডিক প্রকৃতির। তবে অ্যালুমিনিয়াম ও জিংকের অক্সাইডগুলিতে ক্ষারকীয় ও অ্যাসিডিক উভয় গুণই বর্তমান। তাই এদের উভধর্মী অক্সাইড বলে। আবার কার্বন মনোক্সাইডে ক্ষারকীয় ও অ্যাসিডিক কোনও ধর্মই বর্তমান না থাকায় এরা প্রশম প্রকৃতির।

জলের সঙ্গে ধাতু ও অধাতুর বিক্রিয়া: সোডিয়াম, পটাসিয়াম ঠান্ডা জলের সঙ্গে তীব্র বিক্রিয়ায় একই ধরনের গ্যাস উৎপন্ন করে ও প্রচুর তাপ উৎপন্ন হয়, যা ধাতুতে আগুন লাগাতে সক্ষম। ক্যালসিয়ামের সঙ্গে ঠান্ডা জলের বিক্রিয়ার তীব্রতা কম এবং লোহা, অ্যালুমিনিয়াম, জিংক ঠান্ডা বা গরম জলের সঙ্গে বিক্রিয়া করে না। কিন্তু এরা স্টিমের সঙ্গে বিক্রিয়ায় ধাতব অক্সাইড ও গ্যাস উৎপন্ন করে। সিসা, তামা, রুপো কোনও অবস্থাতেই জলের সঙ্গে বিক্রিয়া করে না।

ধাতু ও অধাতুর সঙ্গে অ্যাসিডের বিক্রিয়া: জিংকের সঙ্গে হাইড্রোক্লোরিক বা সালফিউরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় জিংকের লবণ ও হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হয়। এক্ষেত্রে নাইট্রিক অ্যাসিড ব্যবহার করলে হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হয় না। সোডিয়াম, পটাসিয়ামের সঙ্গে অ্যাসিডের বিক্রিয়া তীব্র হওয়ায় এই বিক্রিয়া বিপজ্জনক।

বিভিন্ন ধরনের ধাতুর অ্যাসিড থেকে হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপাদনের ক্ষমতা থেকে দেখা যায় সব ধাতুর সক্রিয়তা সমান নয়, ধাতুদের সক্রিয়তার ক্রম হাইড্রোজেনের সাপেক্ষে নীচে দেওয়া হল। তালিকার বামদিকের ধাতু সবচেয়ে সক্রিয়।

পটাসিয়াম → সোডিয়াম → ক্যালসিয়াম → ম্যাগনেসিয়াম → অ্যালুমিনিয়াম → জিংক → লোহা → লেড (H) → তামা → পারদ → রুপো → সোনা

সক্রিয়তার ক্রম থেকে জানা যায় যারা হাইড্রোজেনের বাঁদিকে আছে, তারা অ্যাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়া করে হাইড্রোজেন উৎপন্ন করে। আবার তালিকার বাঁদিকে থাকা কোনও মৌল ডানদিকের মৌলের যৌগ থেকে তাকে প্রতিস্থাপিত করতে পারে। যেমন— কপার সালফেট দ্রবণে একটি লোহার পেরেক ডোবালে দেখা যাবে যে লোহার পেরেকের গায়ে লালচে বাদামি রঙের ধাতব কপারের একটি আস্তরণ পড়েছে।

যুগশঙ্খ SUPPLI
মঙ্গলবার, ২৯ আগস্ট ২০১৭

ক্লাস এইট-এর টিউশন: ইতিহাস

ঔপনিবেশিক অর্থনীতির চরিত্র

১৭৭০-এর দুর্ভিক্ষের পরে কোম্পানি প্রশাসনিক পরিকাঠামো নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়ে। ইজারাদারি ব্যবস্থা বিশেষ কার্যকরী না হওয়ায় কৃষকদের উপরে রাজস্ব আদায়ের চাপ বাড়তে থাকে। এই কারণে কর্নওয়ালিস রাজস্ব ব্যবস্থাকে নতুন করে সাজান।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

খাজনা-সংক্রান্ত ভুলগুলো কর্নওয়ালিস খুব শীঘ্র ধরে ফেলেন। এই রাজস্ব-সংক্রান্ত সমস্যার জন্য কৃষকরা ও দেশীয় অর্থনীতি ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়। রেশম, কার্পাস, হস্তশিল্প প্রভৃতি ব্যবসায় ভাটা পড়ে। ফলে কোম্পানি কিছু কিছু খাজনাকে চিরস্থায়ী করার সিদ্ধান্ত নেয়।

এই ব্যবস্থায় কোম্পানি জমিদারদের থেকে কত রাজস্ব নেবে তার একটি নির্ধারিত হিসাব করা হয়। এই ব্যবস্থায় জমির রাজস্ব উঁচু হারে হিসাব করা হয়েছিল।

রাজস্ব আদায় করা হবে কার কাছ থেকে সেই নীতি নিয়েও কোম্পানি দোটানায় পড়ে। নবাবি আমলে নবাবরা জমিদারের থেকে খাজনা আদায় করতেন, কিন্তু কোম্পানির শাসনকালে খাজনার জন্য কোনও জমিদারকে দায়িত্ব দেওয়া হয়, কাউকে আবার সরানো হয়, ফলে খাজনা আদায়ের কাঠামো সমস্যার মুখে পড়ে কর্নওয়ালিসের আমলে।

লর্ড কর্নওয়ালিস বাংলার জমিদারদের উন্নতি চেয়েছিলেন, কারণ তিনি ভেবেছিলেন জমিদারদের সম্পত্তির অধিকারকে স্থায়ী ও নিরাপদ করা হলে তারা কৃষির জন্য অর্থ বিনিয়োগ করবে। এছাড়া প্রতিটি কৃষকের থেকে খাজনা আদায় করার থেকে কিছু জমিদারের কাছ থেকে খাজনা আদায় করা অনেক সহজ ছিল। এইসবের মধ্যে দিয়ে জমিতে অধিকার স্থায়ী করার মাধ্যমে কোম্পানির অনুগত গোষ্ঠী হিসাবে জমিদারদের কাজে লাগানোর কথা ভাবা হয়েছিল। এইসব চিন্তা করেই কোম্পানি জমিদারদের সঙ্গে খাজনা আদায়ের চুক্তি হিসাবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু করে। বাংলা, বিহার, ওড়িশার সমস্ত জমির অধিকার জমিদারদের হাতে দেওয়া হয়। এই সমস্ত জমির জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ খাজনা কোম্পানি ঠিক করে দেয়। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জমিদারকে ওই নির্দিষ্ট পরিমাণ খাজনা দিতে হতো তা হলেই জমির উপরে তার মালিকানা স্থায়ী হতো। এক্ষেত্রে উত্তরাধিকার নীতিও চালু ছিল। অর্থাৎ বংশ পরম্পরায় জমির মালিকানা জমিদাররা ভোগ করতে পারতেন। জমিদাররা জমি বিক্রি করতে বা হাতবদল করতেও পারতেন। তবে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ খাজনা দিতে না পারলে কোম্পানি জমি কেড়ে নিত সেই জমিদারের কাছ থেকে। পরে সেই জমি নিলামে তুলে নতুন কোনও ব্যক্তির হাতে কোম্পানি জমিদারির মালিকানা হস্তান্তর করত। এইভাবেই জমি ক্রমেই জমিদারদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হয়ে ওঠে। কর্নওয়ালিসের আশা ছিল এই নীতির ফলে জমিদারদের স্বার্থসিদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কৃষকদেরও উন্নতি হবে।

তবে এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদারদের সম্পত্তি ও সমৃদ্ধি বাড়লেও কৃষকদের অবস্থার বিশেষ কিছু উন্নতি হয়নি। কৃষকদের জমিদারের অনুগ্রহের আশায় থাকতে হতো। প্রাক-ঔপনিবেশিক আমলে কৃষকদেরও তাদের চাষ করা জমির উপর দখলি স্বত্ব ছিল। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু হওয়ার ফলে কৃষকেরা সেই অধিকার হারায়। তারা জমিদারের অনুগ্রহ নির্ভর হয়ে পড়েছিল। তারা ক্রমে জমিদারের প্রজায় পরিণত হয়। জমিদারেরা প্রচুর পরিমাণ রাজস্ব আদায় করতে গিয়ে কৃষকদের উপর অতিরিক্ত করের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছিল। তাছাড়া নানা বাহানায় প্রায়শই নানান রকমের বেআইনি কর আদায় করা হতো কৃষকদের কাছ থেকে। শুধু তাই নয় নির্দিষ্ট পরিমাণ খাজনা দিতে না পারলে কৃষকের জমিও বাজেয়াপ্ত করার অধিকার ছিল জমিদারের। ফলে করের চাপে কৃষকদের অবস্থার ক্রমেই অবনতি হতে থাকে। চড়া হারে কৃষকের থেকে খাজনা আদায় করা জমিদারের পক্ষে একটু অসুবিধাজনক ছিল। এমনি সময় কষ্ট করে দিয়ে দিলেও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় চড়া হারে খাজনা দেওয়া কৃষকদের পক্ষে ছিল অসম্ভব। সেই সময় জমিদারেরা পড়তেন বিপদে, কারণ রাজস্ব কোম্পানিকে দিতে না পারলে সূর্যাস্ত আইনের ফলে জমিদারের মালিকানা নিলামে উঠত।

এই নিয়ম অনুসারে নির্দিষ্ট দিনে সূর্যাস্তের আগে জমিদার যদি নির্দিষ্ট পরিমাণ খাজনা না দিত তবে সেই জমিদারের সমস্ত জমি কোম্পানি নিয়ে নিত। পরোক্ষভাবে বললে বলা যায়, জমির দেখাশোনা করত কৃষক আর ভোগ করত কোম্পানি, জমিদারদের সেই অর্থে কোনও অধিকার ছিল না কোম্পানির উপরে। চাইলেই তাদের অধিকার কেড়ে নিতে পারত কোম্পানি।

বাস্তবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্যে দিয়ে কোম্পানির কর্তৃত্ব ভারতীয় সমাজ ও অর্থনীতিতে দৃঢ় হয়েছিল। সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র তীব্র নিন্দা করেছিলেন এই চিরস্থায়ী প্রথার।

ক্লাস নাইন-এর টিউশন: ইতিহাস

সংবিধান সভা

ফরাসি বিপ্লবে বাস্তিলের পতনের পর নতুন যেসব পরিবর্তন হয়েছিল সেগুলো এবার আমাদের জানতে হবে। ১৭৮৯ সালের ১৭ জুন স্টেটস জেনারেল অধিবেশনে বুর্জোয়ারা তাদের সভাকে 'জাতীয় সভা' বলে ঘোষণা করে। ৯ জুলাই থেকে জাতীয় সভা সংবিধান সভার মর্যাদা পায়। এই সভার প্রতিনিধিগণ ২ বছরের মধ্যে এই সংবিধান রচনা করেন। এতে রাজতন্ত্রের পতন হয়ে প্রজাতন্ত্র শুরু হয়। এখানে রাজার ক্ষমতাকে হ্রাস করে আইন সভার হাতে তুলে দেওয়া হয়। ফ্রান্সকে ৮৩টি প্রদেশে ভাগ করা হয়, প্রদেশগুলিকে জেলায়, জেলাগুলি ক্যান্টন ও ক্যান্টনগুলি কমিউনে বিভক্ত হয়। জনগণকে সম্পত্তির ভিত্তিতে ভোটাধিকার দেওয়া হয় এবং তাদের সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়।

নব সংবিধান অনুযায়ী আইনসভার অধিবেশন বসে এই সভা ৪টি দল গঠন করে— দক্ষিণপন্থী শাসনতান্ত্রিক দল, জিরোন্ডিস্ট দল, জ্যাকোবিন দল ও মধ্যপন্থী নিরপেক্ষ দল। আইন অভিজাত ও 'সিভিল কনস্টিটিউশন অব দ্য ক্লার্জি' অমান্যকারী যাজকদের স্বার্থবিরোধী আইন রচনা করেন। এর আগে রাজা অস্ট্রিয়া রাজের কাছে সাহায্য চাওয়ার জন্য পালাতে গিয়ে ধরা পড়েন। বিপ্লবীরা রাজাকে আটক করে। এর পরেই শুরু হয় মতবিরোধ। জ্যাকোবিন উগ্রপন্থীরা রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করতে চায় কিন্তু বুর্জোয়ারা তার বিরোধিতা করে। বিপ্লবীদের ভয় ছিল রাজার সঙ্গে অস্ট্রিয়ার যোগ আছে, এই অবস্থায় অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার রাজা ফরাসি রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করলে ঝামেলা বাঁধে। আইনসভার চাপে রাজা অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এই ভুল বোঝাবুঝির মধ্যে বিপ্লবীরা রাজপ্রাসাদে আক্রমণ করে। রাজপরিবারকে বন্দি করা হয়। এটি দ্বিতীয় ফরাসি বিপ্লব নামে পরিচিত, রাজানুরাগী বহু মানুষকে হত্যা করা হয়। এই ঘটনাকে 'সেপ্টেম্বর হত্যাকাণ্ড' নামে অবিহিত করা হয়।

রাজতন্ত্রের পতনের পর জিরোন্ডিস্ট ও জ্যাকোবিন দলগুলির প্রাধান্যে নতুন সংবিধানের দাবি করে তাতে তর্কবিতর্কের পর ভোটের দ্বারা ষোড়শ লুইকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেয়। এরপর আসে বিপ্লবী সরকার যে সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার আদর্শে কাজ করে। কিন্তু এতে ফ্রান্সে অরাজকতা ও কালোবাজারি ছেয়ে যায়। জনগণ সব বিষয়ে তাদের বিরোধিতা করে বিপ্লবী সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ইউরোপের অন্যান্য রাজারা ফ্রান্স আক্রমণ করতে এগিয়ে আসে এবং ফরাসি সেনাপতি তাদের সঙ্গে হাত মেলায়। এই অরাজকতার সময়ে জাতীয় সম্মেলনের নেতারা 'সন্ত্রাসের রাজত্ব' নামে এক শাসনব্যবস্থা চালু করে যাতে শাসনভার কয়েকটি কমিটির উপর দেওয়া হয়। তারা কিছু নতুন আইন জারি করেন। এর ফলে জিরোন্ডিস্টকে দমন করে জ্যাকোবিন দলের একাধিপত্য চলে আসে।

জ্যাকোবিন দল রোবসপিয়রের নেতৃত্বে 'প্রজাতান্ত্রিক বর্ষপঞ্জি' চালু করেন। সর্বোপরি অনেক নতুন আইন চালু করেন ধর্মনিরপেক্ষ সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন করেন। কিন্তু ক্রমে তাঁদের ভয়ংকরতা বাড়ে। সন্দেহের আইন দিয়ে অনেক মানুষকে হত্যা করা হয়। অনেক বিপ্লবী খুন হয়। এমনকী রোবসপিয়রও। সন্ত্রাসের বাড়াবাড়ির জন্য তারা জনসমর্থন হারায়। ভালো-খারাপ দুই দিকই ছিল তাদের শাসনের।

ফরাসি বিপ্লব ছিল জনগণের স্বৈরাচারী রাজার বিরুদ্ধে দীর্ঘদিনের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। ১৭৮৯-'৯১ এই আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠে। বিভিন্ন ক্লাব, সংবাদমাধ্যম, পত্রিকা এতে উৎসাহ জুগিয়েছে। এরপর ফরাসি জনগণ সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার আদর্শে এগিয়ে যান। এরপর বিপ্লবী সরকার প্রমাণ করে যে জনগণই সকল ক্ষমতার মূল। এইভাবেই ফ্রান্সের রাজনীতিতে আমূল পরিবর্তন আসে এবং ফ্রান্স মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে পদার্পণ করে।

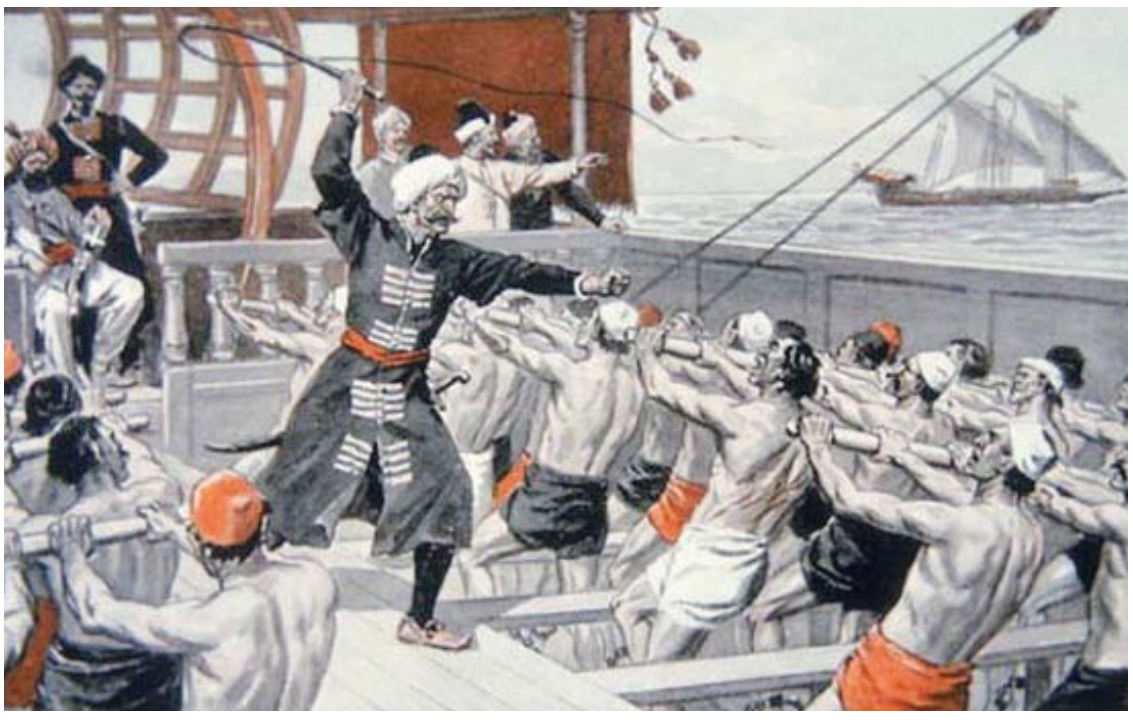

ফরাসি সমাজ ব্যবস্থায় সবথেকে শোষিত ছিল তৃতীয় শ্রেণি বা কৃষক সম্প্রদায়। ফ্রান্সের অন্যতম দার্শনিক ভলতেয়ার বিদ্রূপাত্মক রচনা করে নানা দুর্নীতিকে জনগণের সামনে তুলে ধরেন। অপরজন ছিলেন জাঁ-জেকুইশ-রুশো, তিনি আদর্শ বিপ্লবী এবং বিপ্লবীদের মন্ত্রগুরু। 'অসাম্যের সূত্রপাত' গ্রন্থে তিনি লেখেন মানুষ স্বাধীনসত্তা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু সর্বত্র সে শিকল দ্বারা আবদ্ধ। এই সময় 'ফিজিওক্রাটস' নামে একদল অর্থনীতিবিদের আবির্ভাব হয় যাঁদের মধ্যে কুইসন ছিলেন প্রধান প্রবক্তা, যাঁর মতবাদ শিল্পপতিদের উপর প্রভাব বিস্তার করে। সেই সময় বুর্জোয়া শ্রেণির মানুষরা ছিল অবহেলিত ও করভারে জর্জরিত। বিদ্যা-বুদ্ধি অর্থ থাকলেও তারা ছিল চরম অসাম্যের শিকার। যাজক ও অভিজাতদের সঙ্গে তৃতীয় শ্রেণির আর্থিক বৈষম্য ছিল অনেক বেশি।

রাজার আমলে যে আর্থিক বৈষম্য ছিল, বিপ্লবের ফলে তার পরিবর্তন হয়। সেই সময় রাজারা মনে করতেন স্বয়ং ঈশ্বর তাঁকে রাজা করেছেন। এভাবেই তাঁরা বংশপরম্পরায় শাসন করতেন। এইসব অত্যাচারের ফলেই পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যায়।

যুগশঙ্খ
SUPPLI
মঙ্গলবার, ২৯ আগস্ট ২০১৭

পৃথিবীর পাঁচ রহস্য

রহস্য ভালোবাসে না এমন মানুষ এই পৃথিবীতে খুব কমই আছে। অতি প্রাচীন কাল থেকেই মানুষ রহস্যের পিছনে ছুটছে। কিছু রহস্য মানুষ উদ্ধার করতে পারলেও, এমন কিছু রহস্যও আছে যা মানুষ আজ পর্যন্ত উদ্ধার করতে পারেনি। কত মাথা খাটানো, কত অঙ্ক কষা চলছে, কিন্তু তাদের আসল উদ্‌ঘাটন করা যায়নি। এসব কথা কখনও বইতে উঠে এসেছে, কিছু আমাদের চোখের সামনেই রয়েছে কিন্তু তবুও এদের সত্যতা ধরাছোঁয়ার বাইরে। এসব জেনে তোমরাও ভাববে এসবের কারণ কী? এসব গল্প না সত্যি?

দ্য লস্ট সিটি অব আটলান্টিস

প্লেটোর 'টিম্যাউস' এবং ক্রিটিয়াস' বইতে উল্লেখ রয়েছে অ্যাটলান্টিস বলে এক শহরের। কিন্তু এই শহরের ঠিকানা আজও পাওয়া যায়নি। কোথায় ছিল এই শহর? বিভিন্ন সময়ে হলিউড মুভিতে সিটি অব আটলান্টিসের কথা বারে বারে ফিরে এসেছে। পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন রহস্য এটিই। সময়ের হিসাবে তা প্রায় ১১,৫০০ বছরের প্রাচীন। এত প্রাচীন রহস্য

তবু মানুষ এটি আজ সমাধান করতে পারেনি।

এই রহস্য উদ্ধারের সূত্র প্লেটোই দিয়েছেন। যদি আপনারা কেউ আটলান্টিস খুঁজতে যান তাহলে খুব সহজেই আটলান্টিস পেয়ে যাবেন কারন এটি হারকিউলিসের স্তম্ভের সামনেই অবস্থিত। এর আয়তন ছিল লিবিয়া আর এশিয়ার মিলিত আয়তনের সমান। এত বিশাল একটা শহর মাত্র একদিনেই ধ্বংস হয়ে গেছে। লেখক প্লেটোর ভাষায় in a single day and night of misfortune।

দ্য বগ বডিস

সবার আগে বগ বডিস জিনিসটা কী তা জানা দরকার। মমি আর বগ বডিস কিন্তু এক জিনিস না। মমি হল সেই সব মৃতদেহ যেগুলো নানা রাসায়নিক দ্বারা বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় সংরক্ষণ করা হয় আর বগ বডি হল প্রাকৃতিকভাবে যেসব মৃতদেহ সংরক্ষিত হয়ে থাকে।

ড্যামেনডর্ফ ম্যান, ড্যাটগেন ম্যান, হাসবেক ম্যান, জুরডেনেরফেল্ড ম্যান ইত্যাদি নামের হাজারের উপর বগ বডিস ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় অনেক বগ বডিস নষ্ট হয়ে যায়। এছাড়া মাটির নীচে যেখানে সংরক্ষিত ছিল দেহগুলি, আবিস্কারের পর সঠিকভাবে সংরক্ষণের অভাবে অনেক বগ বডিসই নষ্ট হয়ে গেছে। ফলে বর্তমানে মাএ ৪৫টা বগ বডিস অস্তিত্ব আছে। বগ বডিস এখনও পর্যন্ত মুলত জার্মানি, ব্রিটেন, আয়ারল্যান্ড, নেদারল্যান্ড ও ডেনমার্কে পাওয়া যায়।

মানুষের বোধের বাইরে এই মৃতদেহ (যাদের মধ্যে কিছু খ্রিস্টপূর্ব ৮০০০-এর) প্রকৃতির কারণে নিজেদের ত্বক ও শরীরের নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ টিকিয়ে রেখেছে।

জ্যাক দ্য রিপার

আমরা অনেকেই দ্য ফিফথ মোস্ট অ্যামেজিং ক্রাইমস অভ দ্য লাষ্ট ফিফটি ইয়ারস বইটির নাম শুনেছি। বইটিতে অন্য সব অপরাধীদের ছবি থাকলেও একমাত্র জ্যাক দ্য রিপারের কোনও ছবি নেই। জ্যাক দ্য রিপারের ছবির জায়গায় একটা বড় প্রশ্নবোধক চিহ্ন দেওয়া, এই একটামাত্র কারণই প্রত্যেকের মনে কৌতূহল জাগানোর জন্য যথেষ্ট। কে ছিলেন এই জ্যাক দ্য রিপার? অন্য সিরিয়াল খুনিদের চেয়ে এই একটামাত্র প্রশ্নই জ্যাককে করেছে রহস্যময় চরিত্র। তার না জানা তথ্যগুলিই রিপারকে অন্য গণহত্যাকারীদের থেকে আলাদা করে রেখেছে। সে কতগুলো হত্যা করেছিল? সেটাও আজ পর্যন্ত জানা যায়নি এবং আজ এটি বিতর্কের বিষয়। শুধুমাত্র এইটুকু জানা যায় যে ১৮৮৮ সালের শেষ ভাগে

লন্ডনের হোয়াইটচ্যাপেল এলাকায়, রাতেরবেলায় সংগঠিত হয়েছিল অন্তত পাচঁটি নৃশংস খুন। এর ফলে পুরো লন্ডনে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে, রাস্তায় রাস্তায় মিটিং শুরু হয়, হোয়াইট চ্যাপেল এলাকায় নাগরিকদের দ্বারা রাত পাহারা দেবার জন্য দল গঠন করা হয়। সে সময় হাজার হাজার মানুষকে জেরা করেও অবশেষে পুলিশ প্রমানের অভাবে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। শুধুমাত্র সন্দেহের বশে বেশ কিছু কালো ব্যাগওয়ালা সাধারন নীরিহ মানুষ সাধারন জনগনের আক্রোশেরও শিকার হয়। শেষ পর্যন্ত পুলিশ কমিশনারও চাকুরীতে ইস্তাফা দিতে বাধ্য হয়।

এরপর এক মাসেরও বেশি কোন ঘটনা নয়া ঘটলেও আবার কিছুদিন পর আঘাত হানল রিপার, বছর কুড়ির একটি মেয়েকে কেটে টুকরো টুকরো করে সারা ঘোরেজিগস স পাজল এর মতো ছড়িয়ে রাখল। এরপর আবার সব চুপচাপ। পরের বছর ১৮৮৯ সালে হোয়াইট চ্যাপেল এলাকায় আবার দুটি খুন হল, একইরকমভাবে কিন্তু কেউ কোনওদিনই জানতে পারল না এই দুই হত্যার জন্য আদৌ রিপার দায়ী কি না।

১৮৮৮ সালে জর্জ বার্নার্ড শ সাংবাদিকদের কাছে একটা চিঠি লেখেন যে আসলে হত্যাকারী একজন সমাজ সংস্কারক যে ইস্টএন্ডের সামাজিক অবস্থার ওপর মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায়। আর এই করণেই বার্নার্ড শ কিন্তু রিপার সন্দেহে অনেক গবেষকের তালিকায় আছে।

স্টোনহেঞ্জ

সমতল ভূমির প্রায় ৮ মাইল উত্তরে স্টোনহেঞ্জ অবস্থিত। এতে বৃত্তাকারে বড় বড় দণ্ডায়মান পাথর রয়েছে, সার্কেলের ভিতরে যে কয়টা ব্লুস্টোন আছে তার প্রতিটির ওজন নিখুঁতভাবে ৬ টন এবং এগুলোর চতুর্দিকে মৃত্তিকা নির্মিত বাঁধ রয়েছে। এইটিই ২৫০০-৩০০০ বছরের পুরনো একটি রহস্য। কে বা কারা এটা বানিয়েছে কেনই-বা বানিয়েছে তা আজও অজানা। অনেকের ধারণা এই চক্রটা ব্যবহার করা হত আহত সৈন্যদের আরোগ্য লাভের স্থান হিসাবে। এই নিয়ে অনেক গল্প। অনেকে আবার বিশ্বাস করে এটা একটা বিমানবন্দর, যেখানে এলিয়েনদের যান নামত। তবে যে মতবাদটি সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য

তা হল, এটি একটি ত্যাগের বেদি বা মন্দির মানে এখানে বলি দেওয়া হত। কিন্তু কারা এটা ব্যবহার করত এই প্রশ্নের উত্তর এখনও পাওয়া যায়নি।

স্টোনহেঞ্জের গঠন খানিকটা জটিল। এর বাইরের দিকে একটি বৃত্তাকার পরিখা রয়েছে। প্রবেশপথটির কিছুটা দূরেই রয়েছে মাটির বাঁধ। এ বাঁধের ভেতর চতুর্দিকে বেষ্টন করে আছে ৫৬টি মাটির গর্ত। পাথরগুলোর মধ্যে আরও দুই সারি গর্ত বেষ্টন করে আছে। পাথরগুলোর গঠনের মধ্যে আছে দুইটি বৃত্তাকার এবং দুইটি ঘোড়ার খুরের নলের আকারবিশিষ্ট পাথরের সারি। এছাড়াও কতগুলো পৃথক পাথর রয়েছে অলটার স্টোন বা পূজা বেদির পাথর বা শ্লটার স্টোন বা বধ্যভূমির পাথর।

কিং আর্থার

কিং আর্থার ছিল উথার পেনড্রাগনের ছেলে, যে গ্রেট ব্রিটেনের উপকথার একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। সেখানে সে যুদ্ধের জন্য এবং শান্তির জন্য একজন আদর্শ রাজার চরিত্র

হিসেবে আবির্ভূত হয়। ইতিহাস অনুসারে তিনি ছিলেন একজন রোমান এবং মধ্যযুগের কিংবদন্তির ব্রিটিশ নেতা, যে ষষ্ঠ শতাব্দীর আগের স্যাক্সন আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে ব্রিটেনের প্রতিরক্ষার নেতা হিসেবে নেতৃত্ব দিয়েছিল। এইটি ব্রিটেনের বিষয়ের প্রধান চরিত্র (ব্রেটোন এবং আর্থারিয়ান চক্র), যদিও আর্থারের সম্বন্ধে মতানৈক্য আছে, ধারণা করা হয়, কিং আর্থার একটি আসল মানুষের জীবনীতে গড়ে ওঠা কাল্পনিক চরিত্র, যিনি সত্যিই ছিলেন। কিং আর্থার মুভিটা কিন্তু আমরা অনেকেই দেখেছি।

কিং আর্থার, তাঁর ম্যাজিশিয়ান, মারলিন ও গোলটেবিলের নাইট— এই নিয়েই মিথ গড়ে উঠেছে। মিথ আরও বলে যে তার তলোয়ারটা নাকি পাথরের ভিতর আটকানো ছিল। ষষ্ট শতাব্দীতে তিনি ইংল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড, আইসল্যান্ড, নরওয়ে ও গল রাজ্য জয় করেন। ইতিহাসবীদদের মতে, দ্বিতীয় শতাব্দীর রোমান কমান্ডার লুসিয়াস আর্টোরিয়াস ক্যাস্টাস-ই আসলে কিং আর্থার। ভবিষ্যতে টাইম মেশিন তৈরি না হলে এই রহস্যের সমাধান হলেও হতে পারে।

যুগশঙ্খ SUPPLI
মঙ্গলবার, ২৯ আগস্ট ২০১৭

ক্যুইজ

১) কোন দশায় অক্সিনের ক্রিয়া ভালো হয়?
২) রেশম মথের একটি ব্যাকটেরিয়া ঘটিত রোগের নাম কী?
৩) আন্টার্টিকায় ভারতের প্রথম স্থায়ী গবেষণাকেন্দ্রের নাম কী?
৪) ভাইরাসের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত প্রোটিন নির্মিত আবরণীকে কী বলে?
৫) কোন অণুজীবে মেসোজেম দেখা যায়?
৬) ব্রেড-মোল্ড কী?
৭) মানুষের চোখের কোন কোষ রাত্রীকালীন দৃষ্টিতে সাহায্য করে?
৮) কোন ব্যাকটেরিয়া রান্না করা খাবারকে বিষাক্ত করে?
৯) প্লায়া হ্রদ ভারতে কী নামে পরিচিত?
১০) কে মহলওয়াড়ি বন্দোবস্ত প্রচলন করে?
১১) গুরুমস্তিষ্কের খাঁজ ও ভাঁজকে কী বলে?
১২) কোন তাপকে থার্মোমিটারে ধরা যায় না?
১৩) মাছের দেহের বৃক্ক কী প্রকৃতির?
১৪) খয়ের আসলে কী?
১৫) প্রশস্ত নদীর মোহনাকে কী বলে?
১৬) বিরল বসতি আছে কোন রাজ্যে?
১৭) কোন শহরকে উত্তরের ভেনিস বলা হয়?
১৮) তৈগা কী?
১৯) সোভিয়েত ইউনিয়নের জননী কাকে বলা হয়?
২০) মহাদেশীয় মালভূমির একটি উদাহরণ কী?
২১) বিভব প্রভেদ কী রাশি?
২২) শক্তির চাবিকাঠি কাকে বলে?
২৩) প্রাণীদেহের রক্তসংবহন তন্ত্রের সঙ্গে কোন তন্ত্রের সম্পর্ক থাকে?
২৪) সূর্যালোকে যে সূক্ষ্ম কণিকা থাকে তার নাম কী?
২৫) হিমোসায়ানিন কি ঘটিত প্রোটিন?
২৬) মানবদেহে সালোকসংশ্লেষ হয় না কেন?

২৭) বর্ণালীর কোন রঙে সালোকসংশ্লেষ ভালো হয়?
২৮) রক্তের তারল্য রক্ষা করে কে?
২৯) তাপের স্বরূপ কী?
৩০) অ্যালভিওলাই কোথায় থাকে?
৩১) কোন পর্যায়ের সবগুলি মৌলই তেজস্ক্রিয়?
৩২) উদ্দীপকের প্রভাবে জীবদেহের সাড়া দেওয়ার ক্ষমতাকে কী বলে?
৩৩) কোন হরমোনকে ক্যালোরিজিনিক হরমোন বলে?
৩৪) ব্যক্তজীবী ও গুপ্তজীবী উদ্ভিদের মধ্যে সংযোগরক্ষাকারী জীবটির নাম কী?
৩৫) কোন নদী গ্রস্ত উপত্যকার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত?
৩৬) পশ্চিমবঙ্গের কোন জেলাকে ধানের ভাণ্ডার বলে?
৩৭) বিবর্তনের ফলে কার্যহীন অঙ্গকে কী বলে?
৩৮) পতঙ্গ বা পাখির ডানা কী জাতীয় অঙ্গের উদাহরণ?
৩৯) পূর্বঘাট পর্বতের অন্য নাম কী?
৪০) ডারউইনের মতানুসারে প্রকৃতিতে জীবের সংখ্যা কী হারে বাড়ে?

উত্তর: ১) অন্ধকার দশায়। ২) ফ্ল্যাচেরি। ৩) দক্ষিণ গঙ্গোত্রী। ৪) ক্যাপাসিড। ৫) ব্যাকটেরিয়া। ৬) মিউকর। ৭) রডকোষ। ৮) ক্লসট্রিডিয়াম বটুলিনাম। ৯) ধুন্দ। ১০) হোল্ট ম্যাকেঞ্জি। ১১) সালকাস বা জাইরাস। ১২) লীন তাপ। ১৩) প্রোনেফ্রোস প্রকৃতির। ১৪) একপ্রকারের ট্যানিন। ১৫) খাঁড়ি। ১৬) রাজস্থান। ১৭) আমস্টারডাম। ১৮) উত্তরের সরলবর্গীয় বৃক্ষের অরণ্য। ১৯) ইউক্রেনকে। ২০) কানাডিয়ান শিল্ড। ২১) স্কেলার রাশি। ২২) অক্সিজেনকে। ২৩) শ্বাসতন্ত্রের। ২৪) ফোটন। ২৫) তাম্র। ২৬) ক্লোরোফিল নেই বলে। ২৭) লাল ও নীল। ২৮) সোডিয়াম। ২৯) পদার্থের অণুর গতিশক্তি। ৩০) ফুসফুসে। ৩১) সপ্তম পর্যায়ের। ৩২) উত্তেজনা। ৩৩) থাইরক্সিন। ৩৪) নিটাম। ৩৫) নর্মদা। ৩৬) বর্ধমান। ৩৭) লুপ্তপ্রায় বা নিষ্ক্রিয় অঙ্গ। ৩৮) সমবৃত্তীয় অঙ্গ। ৩৯) মলয়াদ্রি। ৪০) জ্যামিতিক হারে।

এডু টিপস

পরীক্ষার ফলাফল নিয়ে শিশুর ওপর কোনও চাপ সৃষ্টি করবেন না

এটা খুব সত্যি কথা যে, এখন ভীষণ প্রতিযোগিতাময় একটা যুগে আমরা বাস করছি। সামান্য শিথিলতা আপনার বাচ্চাকে ছিটকে দিতে পারে প্রতিযোগিতার ময়দান থেকে। কিন্তু সেই প্রতিযোগিতায় টিকিয়ে রাখার জন্য বাবা-মায়েরা যদি মনে করেন যেনতেন প্রকারেণ ভালো রেজাল্ট করাবেন বলে শিশুটির উপর তার ক্ষমতার বাইরে চাপ সৃষ্টি করবেন তেমনটিও ঠিক নয়।

পরীক্ষায় একজন ছাত্র বা ছাত্রীর ভালো ফল করার পিছনে তার অভিভাবক এবং শিক্ষকদের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আবার অন্যদিকে বাচ্চাদের প্রত্যাশা বা চাওয়া-পাওয়ার উপর বাবা-মা বা শিক্ষকদের প্রভাব অনস্বীকার্য। তাই ছেলেমেয়েরা তাদের প্রত্যাশাগুলিকে পূরণ করার জন্য কী করছে বা এই কারণে তারা মানসিকভাবে চাপের শিকার হচ্ছে কি না, তা একজন অভিভাবক বা শিক্ষকের খেয়াল রাখা জরুরি।

আমাদের মনে রাখতে হবে, পরীক্ষার ফলাফল অভিভাবকত্বের উপর নির্ভরশীল নয়। ছেলেমেয়েদের পরীক্ষার ফলাফলের মধ্য দিয়ে বাবা বা মায়ের অভিভাবকত্বের সাফল্যের বিচার করা ঠিক নয়। অথবা ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষার ফলাফলের জন্য শিক্ষকদের যোগ্যতা বা দক্ষতার বিচার করা যুক্তিযুক্ত নয়। শুধুমাত্র বাবা-মা বা শিক্ষক চেয়েছেন বলেই একজন পরীক্ষার্থী ভালোভাবে পরীক্ষায় পাশ করেছে— তা নয়। বরং একজন পরীক্ষার্থী চেয়েছে বলেই সে পরীক্ষায় ভালো নম্বর পেয়েছে— বিষয়টিকে এইভাবেই বিচার করতে পারলেই সেটা ভালো হবে। বাবা-মা বা শিক্ষক তাদের সন্তান বা ছাত্র-ছাত্রীদের খুব খেয়াল রাখে বলেই তারা পরীক্ষায় ভালো ফল করবে— এমন ধারণার মধ্যে কোনও বাস্তবতা নেই। তাই ছেলেমেয়ে বা ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনার ব্যাপারে অভিভাবক বা শিক্ষকদের উদ্বিগ্ন হওয়াটা পরোক্ষভাবে ছেলেমেয়েদের উপরে খারাপ প্রভাব বিস্তার করে। তাই বড়দের উচিত নিজেদের মনের উদ্বেগগুলি বাচ্চাদের সামনে প্রকাশ না করে, তৃতীয় কোনও ব্যক্তি, সে বন্ধু হতে পারে বা একজন কাউন্সিলর হতে পারেন, তার সঙ্গে আলোচনা করা। আসল কথা হল, বাচ্চারা কিন্তু তাদের নিজেদের কী করনীয় সে সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল থাকে। তারাও নিজের সেরাটাই তুলে ধরতে আগ্রহী থাকে যদি তারা সঠিক পরিবেশ বা উৎসাহ বা গাইডেন্স পায় আর এই বিষয়টা বড়দের উপলব্ধি করা খুবই প্রয়োজনীয়।

শুধুমাত্র একটা পরীক্ষার ফলাফলই একটি শিশুর জীবনের প্রধান বিচার্য বিষয় নয়, একজন মানুষের জীবনে অনেক কঠিন বাধা পেরনোর মধ্যে পরীক্ষায় ভালোভাবে পাশ করা অন্যতম একটি বিষয়। শুধু তাই নয়, পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে একজন পড়ুয়ার তার জীবনের স্থির লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। এই সময় আশেপাশে না তাকিয়ে সোজা পরীক্ষার দিকেই ছুটে যাওয়া দরকার। আসলে শৈশবকে মানুষের জীবন গঠনের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে মনে করা হয়। তাই এই সময়ে লেখাপড়া শিখে নিজের জীবনের উন্নতির বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেওয়া জরুরি। একজন অভিভাবক বা শিক্ষক হিসেবে একজন ব্যক্তির দায়িত্ব হল তার সন্তানকে জীবন-সংগ্রামে টিকে থাকার শিক্ষা দেওয়া। তাকে লক্ষ্য পূরণের জন্য উৎসাহ জোগানো। যদি জীবনে লড়াই করতে গিয়ে ছোটরা কখনও দিশাহীন হয়ে পড়ে, তাহলে বড়দের উচিত তাদেরকে সঠিক পথ দেখিয়ে লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। ভুল পথে গিয়েছে বলে ছোটদের অবহেলা করা বা তাদের আত্মবিশ্বাসে আঘাত দেওয়া উচিত নয়।

আন্তরিকভাবে চেষ্টা করতে হবে, ফলের আশা করা জরুরি নয়— পরীক্ষায় ভালো ফল করার জন্য পরীক্ষার্থীকে মনেপ্রাণে চেষ্টা করতে হবে। পরীক্ষার ফলাফল নিয়ে অযথা ভাবনাচিন্তা করার দরকার নেই। কারণ কাজ করাটা আমাদের নিজেদের নিয়ন্ত্রণের উপরে থাকে, সেই কাজের ফলাফল সবসময়ে আমাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে না। পরীক্ষায় কেমন প্রশ্ন আসবে বা শিক্ষক কীভাবে একজন ছাত্র বা ছাত্রীর উত্তরপত্রের মূল্যায়ন করবেন, তার উপর পরীক্ষার্থীর কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। এছাড়া পরীক্ষায় অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীরা কেমন ফল করবে তা-ও কোনও একজন বিশেষ ছাত্র বা ছাত্রীর পছন্দের উপর ভিত্তি করে হবে না। অথবা পরীক্ষা শুরুর আগেই প্রশ্নপত্র বাইরে বেরিয়ে যাবে কি না, সে বিষয়েও পরীক্ষার্থীর কোনও ভূমিকা থাকে না। তাই এইসব বিষয় নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের অযথা উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনও কারণ নেই। তাদের প্রধান এবং একমাত্র কর্তব্য হল মন দিয়ে পড়াশোনা করে পরীক্ষায় নিজেদের দক্ষতার পরিচয় দেওয়া। এইক্ষেত্রে কোনও খামতি রাখা কাম্য নয়— এটাই ছোটদের বোঝানো উচিত বড়দের। পরীক্ষা নিয়ে অতিরিক্ত প্রেশার কখনোই কাম্য নয়।

অভিভাবকরা যদি এই ব্যাপারটা একটু হৃদয় দিয়ে বুঝে নিজের বাচ্চাটিকে রেসের ঘোড়া বানিয়ে নিজে রিসলদারের চাবুক না হাঁকান তাহলে হয়তো খবরের কাগজে নানা ধরনের অপ্রীতিকর খবরগুলো অদূর ভবিষ্যতে আমাদের আর পড়তে হবে না। খেয়াল রাখবেন আপনার শিশুটি আপনারই। তাকে প্রতিযোগিতার বাজারে নামতেই হচ্ছে কিন্তু যদি সে নিজের আপনজনদের সাহচর্য পায়, সঠিক দিশা পায় তবে নিশ্চিত সে আপনার স্বপ্নপূরণের কাণ্ডারি হবে।

সক্রেটিস

আটের পাতার পর

মূলত প্রাচীন গ্রিসের ধর্ম বলতে শহরের লোকজনের জন্য পুরোহিত ও সরকারি কর্মকর্তাদের ঠিক করে দেওয়া রীতিনীতি ও আচার-অনুষ্ঠানকে বোঝাত। পূর্বপুরুষের ঐতিহ্য আক্ষরিকভাবে ধরে রাখার নামই ছিল পবিত্রতা। অর্থাৎ ধর্ম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। সে অর্থে ধর্মের বিরুদ্ধে কোনও কিছু করা মানে ছিল রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপরাধ করা।

সক্রেটিসের জন্য দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার হল তার সমসাময়িক সমাজ তার মতো প্রখর জ্ঞানী ছিল না। তারা ছিল রক্ষণশীল এবং সংকীর্ণমনা। সে সমাজের মানুষ বহু ঈশ্বরবাদে বিশ্বাসী ছিল। ব্যাপারটা অনেকটা এমনই ছিল যে, ঈশ্বর তাদের সৃষ্টি করেননি বরং তারাই ঈশ্বরদের সৃষ্টি করেছিল। সেই সময়ে ঈশ্বরের সম্পর্কে নানান কল্পকাহিনি প্রচলিত ছিল, যেখানে দেখা যেত দেবতারা সবসময় মানুষের উপকার করছেন না। বরং কখনওবা হিংস্র হয়ে উঠেছেন, কখনওবা ক্ষমতার প্রতাপে অন্ধ হয়ে মানবজাতির ক্ষতি সাধন করেছেন। কিন্তু সক্রেটিস বিশ্বাস করতেন দেবতারা এরকম হতে পারেন না। তারা সর্বদা সত্যবাদী, উপকারী এবং জ্ঞানী। তিনি বিশ্বাস করতেন দেবত্ব যৌক্তিকতার অপর নাম। তারা মানুষের কাছে অর্থহীন আচার-অনুষ্ঠান আশা করেন না। তার এই তত্ত্ব ধর্মীয় রীতিনীতিগুলোকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে বলে তার উপর এই অভিযোগও আনা হল যে তিনি মানুষকে ঈশ্বর থেকে পৃথক করতে চাইছেন।

মৃত্যুদণ্ড

৩৯৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দে আদালতে সক্রেটিসের বিচারের রায় দেওয়ার জন্য ৫০১ (মতান্তরে ৫০০ জন) জন জুরির সমন্বয়ে জুরিবোর্ড গঠন করা হল। সক্রেটিসের যুক্তি হেরে যায়। ২২১ জনের নির্দোষ ঘোষণার বিপরীতে ২৮০ জন সক্রেটিসকে দোষী সাব্যস্ত করলেন। সম্ভবত সক্রেটিস নিজের যুক্তিতে অনড় থেকে বিপদ বাড়িয়েছিলেন। নিয়ম অনুযায়ী সক্রেটিসকেও জিজ্ঞেস করা হয় তিনি নিজের দোষ স্বীকার করে নিচ্ছেন কিনা। কিন্তু সক্রেটিস যেন খুব করে চাইছিলেন তাঁকে মৃত্যুদণ্ডই দেওয়া হোক। দোষ স্বীকার করলে রায় অন্যরকমও হতে পারত। কিন্তু তিনি নিজেকে নির্দোষ দাবি করেন এবং তার কর্মকাণ্ডকে যুক্তিযুক্ত বলেন। তিনি তার অসাধারণ প্রজ্ঞা আর প্যারাডক্সিকাল বাচনভঙ্গিতে বিচারকদের কটাক্ষ করেন। দোষ স্বীকার তো দূরের কথা, তিনি বরং পুরস্কার দাবি করে বসলেন। বিচারকরা এতে ক্ষিপ্ত হয়ে যান। ফলে অবশ্যম্ভাবীভাবে রায় তার বিরুদ্ধে যায়। মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করা হয়। তিনি শান্তভাবে রায় মেনে নেন।

জীবনের শেষদিনেও তিনি ছিলেন হাসিখুশি ও সহজ স্বাভাবিক। বিষ নিয়ে আসা লোকটির হাত থেকে বিষের পেয়ালা নিয়ে 'হেমলক' পান করতে তিনি খুব একটা বিলম্ব করেননি। বিষ পান করার পর তিনি বিষক্রিয়ায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ার আগে পর্যন্ত ধীরে ধীরে হাঁটাহাঁটি করেন। তার বন্ধু এবং অনুসারীরা তাকে ঘিরে ছিলেন। যখন বিষ কাজ করতে শুরু করল, তার পা অবশ হয়ে এল, তিনি লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে। ক্রিটো, অ্যাপোল্লোডোরাস, জেনোফোন সবাই একসঙ্গে কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন।

সক্রেটিসের দর্শন সম্পর্কে কোনও লিখিত দলিল না থাকাটাই মূল সমস্যা। সক্রেটিসের কয়েকজন অনুসারী তার সঙ্গে কথোপকথনগুলো লিখে গেছেন, যেগুলো 'লোগোই সক্রাটিকো' বা 'সক্রেটিক অ্যাকাউন্টস' নামে পরিচিত। এদের মধ্যে কেবল প্লেটো আর জেনোফোনের ডায়লগগুলোই টিকে আছে। তবে প্লেটোর ডায়লগগুলো সক্রেটিস সম্পর্কে অধিক স্বচ্ছ ধারণা দেয়।

উত্তরণ
যুগশঙ্খ SUPPLI
মঙ্গলবার, ২৯ আগস্ট ২০১৭

উত্তরণ-এর **জেনারেল নলেজ** তোমাদের কেমন লাগছে, মেল করে জানাও আমাদের

বিতর্কের মধ্যে দিয়ে আজও অমর ‘সক্রেটিস’

রেশমী চন্দ্র

পৃথিবীর ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানী ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম দার্শনিক সক্রেটিস। জীবদ্দশায় তিনি যেমন ধাঁধার মতো ছিলেন, মৃত্যুর পরও চিরন্তন এক বিস্ময়ে পরিণত হয়েছেন। দর্শন বিষয়ে যদিও কিছুই লিখে যাননি, তবুও হাতে গোনা কয়েকজন মহামানবের তালিকায় তাঁকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যাঁদের দ্বারা পৃথিবীর মানুষের দর্শন চিরতরে বদলে গেছে। তাঁর জীবনী নিয়ে ব্যাপক মাত্রায় বিতর্ক রয়েছে। তার ফলস্বরূপ সক্রেটিস অমর হয়ে রয়েছেন, ইতিহাসের খাতায়।

জন্ম ও প্রাথমিক জীবন

সক্রেটিস ৪৬৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দে (মতান্তরে ৪৭০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে) এথেন্সের সিরকা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা সফ্রোনিসকাস ছিলেন একজন রাজমিস্ত্রি ও ভাস্কর, মা ফায়েনারেত ছিলেন একজন ধাত্রী। সফ্রোনিসকাসের আয় একেবারে কম ছিল না, আবার পুরোপুরি স্বচ্ছলও বলা যায় না। যুবক সক্রেটিসকে সঠিক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে তার বাবা সফ্রোনিসকাস দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ ছিলেন। তিনি এথেন্সের সকল যুবকের মতো সাধারণ বাধ্যতামূলক শিক্ষার বাইরেও সক্রেটিসের উচ্চতর শিক্ষার ব্যবস্থা করেন, বিশেষ করে সাহিত্য, সংগীত এবং অ্যাথলেটিকসে। ফলে সক্রেটিস কাব্যচর্চা, সংগীত ও শরীরচর্চায় পারদর্শী হয়ে ওঠেন।

অ্যালোপেস নামক রাজনৈতিক অঞ্চলে বেড়ে ওঠা সক্রেটিস শৈশব থেকেই রাজনীতির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। এথেন্সের নিয়মানুযায়ী ১৮ বছর বয়সের সকল যুবককে রাজনৈতিক দায়িত্ব পালন করতে হতো। এসব দায়িত্বের মধ্যে মূল দায়িত্ব ছিল মিলিটারিতে যোগ দেওয়া। অন্যদিকে মিলিটারি বিষয়ক বিভিন্ন দিক নির্ধারণ এবং বিচার বিভাগ পরিচালনার জন্য যে অ্যাসেম্বলি ছিল, তাতেও যোগ দিতে হত। এই কাজগুলোতে কোনও আপত্তি ছিল না সক্রেটিসের।

তখনকার এথেন্স সমাজে নারীর সৌন্দর্য নয়, বরং পুরুষের সৌন্দর্য নিয়ে চর্চা হতো। সুন্দর, সৌম্য চেহারার পুরুষদের বিশেষ মূল্য দেওয়া হতো সমাজে। কিন্তু দুর্ভাগ্যই বলতে হয়, সক্রেটিস ছিলেন অতিমাত্রায় কুৎসিত। চোখগুলো তার কোটর থেকে যেন বেরিয়ে আসতে চাইত। নাকটি ছিল একেবারেই বোঁচা। তথাপি সক্রেটিস নিজের চেহারার এই কদর্য রূপের জন্য বিন্দুমাত্র দুঃখী ছিলেন না। নিজেকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন না করে বরং একই ময়লা জামা গায়ে দিয়ে আর স্যান্ডেল পায়ে দিয়ে দিনের পর দিন কাটিয়ে দেওয়া সক্রেটিসকে আরও কদর্য দেখাত। এক কথায় কদর্য শব্দটিও যেন তাঁর জন্য মানানসই নয়।

দাম্পত্য জীবন

সক্রেটিসের দাম্পত্য জীবন নিয়ে ইতিহাসবিদদের মধ্যে রয়েছে চরম বিতর্ক। কেউ মনে করেন তার একমাত্র স্ত্রী জ্যানথিপ, যাঁর গর্ভে জন্ম হয় সক্রেটিসের তিন ছেলের। আবার কেউ দাবি করেন জ্যানথিপের ঘরে সক্রেটিসের প্রথম সন্তান ল্যাম্প্রোক্লেসের জন্ম। পরে সক্রেটিস মির্তো নামক এক নারীকে বিয়ে করেন। মির্তোর গর্ভে জন্ম হয় সক্রেটিসের অপর দুই ছেলে সফ্রোনিসকাস এবং মেনেক্সেনাসের। তবে আরেকদল পণ্ডিত মনে করেন সক্রেটিস আসলে দু’জনকে একসময় বিয়ে করেছিলেন, কেননা এথেন্সে তখন নারীর বিপরীতে পুরুষের সংখ্যা কম ছিল।

যোদ্ধা জীবন

সক্রেটিস তার মিলিটারি দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছিলেন। তিনি পতিদা যুদ্ধে বেশ বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করেন এবং এথেন্সের বিজয়ে সাহায্য করেন। যুদ্ধের সময় তিনি

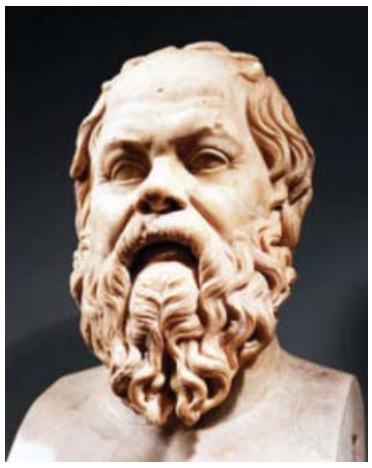

এথেন্সের জেনারেল অ্যালসিবিয়াদেসের জীবন বাঁচান। তিনি দিলিয়াম এবং অ্যাম্ফিপোলিস এর যুদ্ধেও অংশ নেন। তবে শেষোক্ত উভয় যুদ্ধে এথেন্সের পরাজয় ঘটে।

পেলোপনেসিয়ান যুদ্ধ

৪৩১-৪০১ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে এথেন্সবাসী তাদের ইতিহাসের সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী এবং রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। প্রতিবেশী স্পার্টানদের সঙ্গে এই যুদ্ধই পেলোপনেসিয়ান যুদ্ধ নামে পরিচিত। এই যুদ্ধে এথেন্সের একটি শ্রেণি, বিশেষ করে অভিজাত শ্রেণি, স্পার্টানদের পক্ষে চলে যায়। কেননা এথেন্সের গণতন্ত্র ও মানুষের মতো প্রকাশের স্বাধীনতায় তাঁরা অসন্তুষ্ট ছিলেন। তার চেয়ে স্পার্টান সমাজ তাদের পছন্দ ছিল যেখানে সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা চালু ছিল এবং সমাজের নিচু শ্রেণির কথা বলার কোনও অধিকার ছিল না। যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত স্পার্টানদেরই জয় হয়। তবে স্পার্টানরা সরাসরি এথেন্সের ক্ষমতা নিয়ে নেয়নি। বরং তাদের সমর্থক অভিজাত এথেন্সবাসীদের মধ্যে বাছাই করে ৩০ জন ব্যক্তিকে ক্রিটিয়াসের নেতৃত্বে এথেন্সের ক্ষমতায় বসিয়ে দেয়। এই ৩০ জন ‘দ্য থার্টি’ বা ‘টাইরেন্ট থার্টি’ নামে পরিচিত হয়।

শুরু বিতর্ক

বিভিন্ন কারণে ডেমোক্র্যাটরা সক্রেটিসকে গণতন্ত্রের শত্রু ভাবতে লাগল। অ্যাম্ফিপোলিসের যুদ্ধের সাত বছর পর আনুমানিক ৪১৫ খ্রিস্টাব্দের দিকে যখন এথেন্সের নৌবাহিনী সিসিলি দ্বীপে আক্রমণ করার প্রস্তুতি নিচ্ছিল, তখন এথেন্সে দেবী হার্মিসের কিছু মূর্তি ভেঙে ফেলা হয়। উল্লেখ্য, দেবী হার্মিসকে বলা হয় ভ্রমণকালীন নিরাপত্তা দানের দেবী। এই ঘটনার কয়েকদিনের মধ্যে ইলিউসিনিয়ান শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান -এর অপবিত্রকরণ করে একদল লোক। অপবিত্রকরণ বলতে তারা অনুষ্ঠানটি কোনও পুরোহিতের উপস্থিতি ব্যতিরেকে নিজেদের বাড়িতে পালন করে যা রীতি-বিরোধী। এই উভয় কাজেই যার নাম সবচেয়ে বেশি উচ্চারিত হয়, তিনি অ্যালসিবিয়াদেস। ফলে তাকে নৌবাহিনী থেকে প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। শাস্তির ভয়ে তিনি স্পার্টায় আশ্রয় নেন।

কিছুদিনের মধ্যেই ধর্মবিরোধী কর্মকাণ্ডের জন্য অনেকের শাস্তি হয়। দেখা যায় অনেকেই সক্রেটিসের ঘনিষ্ঠ। এতে সামান্য পরিমাণে হলেও সক্রেটিসের উপর সন্দেহ সৃষ্টি হয়। এথেন্সের দুই প্রধান শত্রুর সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে অ্যালসিবিয়াস হয়ে ওঠেন এথেন্সের ডেমোক্রেটদের প্রধান শত্রু। কিন্তু এই জটিল পরিস্থিতেও সক্রেটিস অ্যালসিবিয়াসের সঙ্গে তার সম্পর্ক বজায় রাখেন এবং তার প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করেন। ফলে অ্যালসিবিয়াদেসের কর্মকাণ্ডে পরোক্ষভাবে সক্রেটিসের হাত আছে বলেই ধারণা করে এথেন্সবাসী।

৪০৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দে যখন টাইরেন্ট থার্টির শাসন চলছে, তখন তাদের প্রধান ক্রিটিয়াস সক্রেটিসকে ৩০ বছরের নীচে কোনও যুবকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে নিষেধ করেন। একদিকে সক্রেটিসের সঙ্গে ক্রিটিয়াসের অনেক আগে থেকেই ভালো সম্পর্ক ছিল, অন্যদিকে সক্রেটিস ক্রিটিয়াসের আদেশ নির্দ্বিধায় মেনে নিয়েছিলেন। এই দুটি বিষয় সন্দেহ ঘনীভূত করে।

এদিকে ‘দ্য থার্টি’ এথেন্সের গণতন্ত্রকামীদের উপর অত্যাচার শুরু করে। তারা অসংখ্য ডেমোক্র্যাটকে নির্বাসনে পাঠায়। অনেককে অন্যায় অভিযোগ দিয়ে হত্যা করে। নির্বাসিতদের একদল সংগঠিত হয়ে ৪০৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দে এথেন্সে ফিরে আসে এবং ক্রিটিয়াসকে হত্যা করে। স্পার্টার মধ্যস্থতায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। এথেন্সে পুনরায় গণতন্ত্র ফিরে আসে এবং ডেমোক্র্যাটরা জেনারেল অ্যামনেস্টি বা সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে। ফলে সক্রেটিসের প্রতি তাদের সন্দেহ প্রবল হলেও অ্যামনেস্টির কারণে তারা গণতন্ত্র বিরোধিতার নামে সক্রেটিসকে ফাঁসাতে পারছিল না।

অভিযোগ

অ্যামনেস্টির কারণে আর কোনওভাবে ফাঁসাতে না পেরে সক্রেটিসের নামে ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগ আনা হয়। অভিযোগে বলা হয় তিনি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ধর্মের ক্ষতি করেছেন, ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেননি, যুব সমাজকেও ধর্মবিরোধী করেছেন।

এরপর সাতের পাতায়